তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০১২

মিসরে সালাফীদের উত্থান

প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা

The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

৯ম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০১২

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৪৪৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ১৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও সোনালী প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

➪ **সম্পাদকীয়** ২
➪ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
➪ **আক্বীদা**
সঠিক আক্বীদা পোষণ না করার পরিণাম ৫
মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
➪ **তারবিয়াত**
কুরআন শিক্ষা : ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা ৭
হোসাইন আল-মাহমূদ
➪ **আহলেহাদীছ আন্দোলন**
দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন ১২
ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
➪ **বিশেষ নিবন্ধ**
কা'বা মুশাররাফাহ ও মাসজিদুল হারাম ১৫
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
➪ **সাক্ষাৎকার**
মুহতারাম আমীরে জামা'আত ২১
➪ **সাময়িক প্রসঙ্গ**
মিসরে সালাফীদের উত্থান : প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা ২৪
আব্দুল আলীম
➪ **পরশ পাথর**
আলোর মিছিলে খ্যাতনামা বৃটিশ সাংবাদিক রিডলে ৩০
➪ **ইতিহাসের পাতা থেকে**
স্পেন বিজয় : ইসলামের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ৩৫
ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
➪ **শিক্ষাঙ্গন**
হিজরী সনের পরিচিতি ৩৯
আব্দুর রশীদ
➪ **স্মৃতিচারণ**
নতুন অভিযাত্রার প্রারম্ভে ৪২
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায্যাক
➪ **তারুণ্যের ভাবনা**
দাড়ি রাখব কেন? ৪৫
শরীফ আবু হায়াত অপু
➪ **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৭
➪ **ভিনদেশের চিঠি** ৪৯
➪ **সংগঠন সংবাদ** ৫১
➪ **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫৫
➪ **আইকিউ** ৫৬

সম্পাদকীয়

বিশ্ব বিজয়ী আদর্শ ইসলাম

আদর্শ চির ভাস্বর, চির অম্লান। যেকোন দেশ ও জাতি আদর্শকে সামনে রেখে গড়ে উঠে। যতদিন আদর্শের উপর অটল থাকে ততদিন ঐ জাতি সমুন্নত থাকে। যখন আদর্শের পতন ঘটে তখন সর্বক্ষেত্রে পতন ঘটে।

পৃথিবীর পরীক্ষিত দিগ্বিজয়ী আদর্শ হল ইসলাম, যা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। বর্তমানে মতবাদ বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবী সন্ত্রাস আর নৈরাজ্যের অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়েছে। কারণ, কোন দর্শনই বিশ্ব মানবতাকে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারছে না। ফলে নিত্য-নতুন দর্শনের আবির্ভাব হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পতনও হচ্ছে। কোন মতবাদই স্থায়ী হতে পারেনি। এভাবে যত মতবাদই সৃষ্টি হোক তার ধ্বংস সুনিশ্চিত। ইসলামই একমাত্র চিরস্থায়ী আদর্শ।

আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল উক্ত মহাসত্যের আহ্বান মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তাতে নিরস্ত্র ইবরাহীমের আদর্শের নিকট ক্ষমতাধর নমরূদ ও আযরের পতন হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) চির সম্মানিত হয়েছেন। নমরূদ-আযর চির লাঞ্ছিত-অপদস্ত হয়েছে। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসকগোষ্ঠী ফেরআউন, হামান, কারূণ অনন্তকালের জন্য অভিশপ্ত হয়েছে, হয়েছে চির অপমানিত। পক্ষান্তরে আদর্শমণ্ডিত নিঃস্ব মূসা (আঃ) পেয়েছেন বিশ্ববিজয়ের মর্যাদা খচিত মুকুট। আরব সম্রাট আবু জাহল, আবু লাহাবের নষ্ট মস্তক ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বহিস্কৃত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শের সামনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে ইসলামকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে *(ছফ ৯)*। আল্লাহ তা'আলার এই চ্যালেঞ্জ ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত *(ছহীহ মুসলিম হা/৭৪৮৩)*।

উক্ত বাণীই প্রমাণ করে পৃথিবীতে যে মতবাদেরই আবির্ভাব হোক তার উপরই ইসলাম বিজয়ী হবে। ইসলামই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রোম সম্রাটের নিকট আবু সুফিয়ান মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করলে তিনি বলেন, 'তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে অতি সত্বর মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমার দুই পায়ের নীচের স্থানটুকুরও মালিক হয়ে যাবে। ... আমি যদি তাঁর নিকট থাকতাম তবে তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম *(বুখারী হা/৩)*। উক্ত বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে এবং রোম সম্রাটের সিংহাসন ইসলামের করতলগত হয়েছে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, পৃথিবীর এমন কোন মাটির ঘর ও তাঁবুও অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে ইসলামের কালেমা প্রবেশ করবে না *(আহমাদ হা/২৩৮৬৫, সনদ ছহীহ)*। অর্থাৎ ইসলাম সর্বত্র বিজয় লাভ করবে। অন্যত্র তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে সমগ্র পৃথিবীকে একত্রিত করে দেখালেন। আর আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখলাম। অতি সত্বর আমার উম্মতের শাসন ঐ সমস্ত এলাকা পর্যন্ত পৌঁছানো হবে যতদূর পর্যন্ত এলাকা আমাকে দেখানো হয়েছে *(ছহীহ মুসলিম হা/৭৪৪০)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে নব্য মতবাদপুষ্ট ব্যক্তিরা ইসলামকে ভয় পায়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, পুঁজিবাদ, উদারতাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদের দুর্গন্ধে মানব জীবন অতিষ্ঠ। অর্থনৈতিক মন্দা, পারমাণবিক বোমার অশনি সংকেত, ক্ষেপণাস্ত্রের মহড়া, সাম্রাজ্যবাদী জিঘাংসা, ভূগর্ভের সম্পদ লুণ্ঠন, মানব হত্যার রেকর্ড বিশ্ববাসীকে প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত করেছে। উক্ত মতবাদগুলো এখন ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত পচা ময়লার ভাগ্যবরণ করেছে। সেজন্য তথাকথিত বিশ্বমোড়ল রাষ্ট্র আমেরিকা-বৃটেনে মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাবতীয় ধর্ম, দর্শন ও থিউরী পশ্চাতে নিক্ষেপ করে ইসলামের নিরাপদ আশ্রয়ে ঠাঁই নিচ্ছে। ফালিল্লাহিল হামদ। উক্ত বাস্তবতার কারণে নতুন কৌশল অবলম্বন করে মূল ইসলামকে তারা বিকৃত করে মুসলিম জনসাধারণের সামনে পেশ করেছে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করছে। সে সাথে মডারেট ইসলামপন্থীদের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী উক্ত রাষ্ট্রগুলোতে তাদের যাতায়াতে কোন বাধা নেই।

ইসলাম বিরোধী চক্রগুলো নানা অপতৎপরতা চালালেও প্রকৃত ইসলামের অনুসারী সালাফী ও আহলেহাদীছদেরকে ঠিকই তারা ভয় পায়। ইসলাম বিদ্বেষী আধুনিক গবেষকরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, Over the long term, the social costs of the spread of the salafi movement to the masses would be very high. 'দূর ভবিষ্যতে সালাফী দাওয়াতের প্রসারের সামাজিক মূল্য জনগণের মাঝে অতি উচ্চে অবস্থান নিবে'। কিন্তু কেন? অথচ তাদের কোন অস্ত্র নেই, নেই কোন সম্পদ ও লোকবল। কারণ হল, তাদের কাছে সংরক্ষিত আছে বারবার পরীক্ষিত ঔষধ বিশ্ববিজয়ী আদর্শ ইসলাম। তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত প্রকৃত ইসলামের অনুসারী। এই আদর্শের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

বিজয়ের জাজ্বল্য প্রমাণ এদের মাঝেই রয়েছে। বৃটিশ-বেনিয়া গোষ্ঠী উপমহাদেশের স্বাধীনতা হরণ করে হত্যা-লুণ্ঠন করলেও অবশেষে টিকতে পারেনি। সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল, তিতুমীর, এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী আহলেহাদীছ সিপাহসালারদের গড়ে তোলা আদর্শিক আন্দোলনের মুখে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

অতএব ইসলাম বিশ্ববিজয়ী আদর্শ তাতে সন্দেহ নেই। মানবতার শেষ আশ্রয়স্থল এখানেই। আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত ইসলামকে বুঝার ও তার উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন এবং ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম ভূখণ্ডকে হেফাযত করুন- আমীন!!

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা

আল-কুরআনুল কারীম :

١– فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ–

'অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

٢– إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ-

'যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে, তোমাদেরকে এর পরে সাহায্য করবে? আর আল্লাহ্র উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে' *(আলে ইমরান ১২০)*।

٣– قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ–

'তুমি বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে না, তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক এবং অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরই মু'মিনদের ভরসা রাখা উচিৎ' *(তাওবা ৫১)*।

٤– وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ–

'আসমানসমূহ ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্রই এবং তাঁরই কাছে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর, আর তোমরা যা কিছু কর সে ব্যাপারে তোমার রব অনবহিত নন' *(হূদ ১২৩)*।

٥– وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً–

'আর তুমি নির্ভর কর সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে অবহিত' *(আনফাল ৫৮)*।

٦– إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ–

'কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ যা মুমিনদের দুঃখ দেয়ার জন্য তৈরী করা হয়; তবে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। মুমিনদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা' *(মুজাদালাহ ১০)*।

٧– وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا-

'আর তুমি কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করো না; তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্র উপর; অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট' *(আহযাব ৪৮)*।

٨– الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ-

'যাদেরকে (উহুদের ময়দানে উপস্থিত ঈমানদারগণকে) মানুষেরা বলেছিল যে, নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু তা তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক *(আলে ইমরান ১৭৩)*।

١٠–وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً-

'এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ তাঁর জন্য উপায় বের করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাণ/সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন' *(ত্বালাক ৩)*।

١١– وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ-

'যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টিদাতা এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও' *(শূরা ৬)*।

١٢– وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ–

'যে বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর না কেন, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই ওপর আমি তাওয়াক্কুল করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই' *(শূরা ১০)*।

١٣– فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-

'আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে' *(শূরা ৩৬)*।

١٤– وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ–

'আর আমরা (রাসূলগণ) কেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব না, অথচ তিনিই আমাদেরকে আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। আর তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ, আমরা তার উপর অবশ্যই ছবর করব। আর নির্ভরকারীদের আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা উচিৎ' *(ইবরাহীম ১২)*।

١٥– وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ-

'(মূসা আ. ফেরআউনকে) আর আমার বিষয়টি আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি; নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা' *(মুমিন ৪৪)*।

١٦– إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ–

'(শু'আইব আ. তাঁর কওমকে) আমি কেবল আমার সাধ্যমত সংশোধন করে দিতে চাই। আর আমার যা কিছু তাওফীক হয় তা শুধু আল্লাহ্র সাহায্যেই হয়ে থাকে; আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি' *(হূদ ৮৮)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১৮– عن عُمَر قَالَ سمعتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে তবে তিনি তোমাদেরকে রিযিক দিতেন যেভাবে তিনি পাখিকে রিযিক দেন। সকালে তারা খালিপেট নিয়ে উড়াল দেয়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে উদরপূর্তি করে' *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৯৯, সনদ ছহীহ)*।

১৯–عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ : كنت خلف النَّبيّ – صلى الله عليه وسلم – يوماً ، فَقَالَ : ((يَا غُلامُ ، إنِّي أعلّمُكَ كَلمَات : احْفَظ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظ اللهَ تَجدْهُ تُجَاهَكَ ، إذَا سَأَلْتَ فَاسأَل الله ، وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ باللهِ ، وَاعْلَمْ : أنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ بشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَت الأَقْلاَمُ وَجَفَّت الصُّحفُ–

রাসূল (ছাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে বৎস! আল্লাহ্র বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, আল্লাহ তোমাকে হেফাযতে রাখবেন। আল্লাহ্র হক্ব আদায় কর, তবে তুমি আল্লাহ্কে তোমার সম্মুখে পাবে। আর যখন তুমি কারো কাছে সাহায্য চাইতে হয় তখন আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ, যদি সমস্ত মাখলুক একত্রিত হয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায় তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং দফতরসমূহ শুষ্ক হয়ে গেছে (অর্থাৎ তাক্বদীর লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। তাতে আর পরিবর্তনের সুযোগ নেই)' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩০২, সনদ ছহীহ)*।

২০– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللَّه قَالَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مُحَارِبَ بْنَ خَصَفَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ منْهُمْ يُقَالُ لَهُ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِث حَتَّى قَامَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بالسَّيْف فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ منِّي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَقَطَ السَّيْفُ منْ يَده فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ منِّي قَالَ كُنْ كَخَيْرِ آخذ ... فَخَلَّى سَبِيلَهُ–

(রাসূল (ছাঃ) স্বীয় তরবারী গাছে ঝুলিয়ে গাছের নিচে ঘুমিয়ে ছিলেন। এক বেদুঈন এই সুযোগে রাসূলের তরবারী হস্তাগত করল) তাকে গওরাছ বিন হারেছ নামে ডাকা হত। সে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর তরবারী উচিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, "কে আপনাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?" রাসূল (ছাঃ) বললেন, "আল্লাহ"। ফলে বেদুঈনের হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। রাসূল (ছাঃ) তা কুড়িয়ে নিয়ে এবার তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "বল! কে তোমাকে রক্ষা করবে আমার হাত থেকে?" তখন সে বলল, "(আশা করি) আপনি উত্তম তরবারী ধারণকারী হবেন (অর্থাৎ ক্ষমা করে দেবেন)"...এরপর রাসূল (ছাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৩০৫)*।

২১– عَبْد الله بْن مَسْعُود قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ)

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি যেন এখনো রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে আছি যখন তিনি কোন একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যাকে তার কওমের লোকেরা প্রহার করে রক্তাক্ত করেছিল; আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কওমের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩১৩)*।

২২–عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতে এমন কিছু লোক প্রবেশ করবে যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মত (অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর পূর্ণভাবে তাওয়াক্কুলকারী) *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২৫)*।'

২৩– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم : الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وأَحَبُّ إِلَى اللَّه منَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيف وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّه وَلاَ تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল ঈমানদারের হতে অধিক উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। প্রত্যেক যা কিছুতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা প্রতিপালনে আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা কর। আর তাতে দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। যদি তোমার কোন কাজে কিছু ক্ষতি সাধিত হয়, তখন তুমি এভাবে বলো না যে, "যদি আমি কাজটি এভাবে করতাম তা হলে আমার জন্য অমুক অমুক হত।" বরং বল, "আল্লাহ এটাই তাক্বদীরে রেখেছিলেন। আর তিনি যা চান তা-ই করেন।" নিশ্চয় "যদি" শব্দটি শয়তানের কাজের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৮)*।

২৬– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের সত্তর হাযার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে বিনা হিসাবে। তারা হচ্ছে যারা মন্ত্র-তন্ত্র করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তাদের রবের উপর ভরসা রাখে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৪৭২)*।

বিদ্বানদের কথা :

১. সাঈদ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, ঈমানের সামগ্রিক পরিচয় হল তাওয়াক্কুল *(হান্নাদ বিন সারী, কিতাবুয যুহদ ১/৩০৪ পৃঃ)*।

২. ইমাম আহমাদ বলেন, তাওয়াক্কুলকারীর অবশ্যই প্রচেষ্টা থাকতে হবে। যদি সে চেষ্টা ছাড়াই কেবল ভরসা করে বসে থাকে তবে সেটা হবে নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা *(আদাবুশ শারঈয়াহ ৩/২৭০ পৃঃ)*।

৩. ইবনু তায়মিয়া বলেন, তাওহীদ, সুস্থ বুদ্ধি এবং শরী'আতের একত্রিত রূপ হল তাওয়াক্কুল *(ইবনু কাসেম, কিতাবুত তাওহীদ ২৫১ পৃঃ)*।

৪. ইবনুল কাইয়েম বলেন. তাওয়াক্কুল হল সবচেয়ে বড় প্রতিরোধক যার মাধ্যমে মানুষ লোকের দেয়া কষ্ট, বিপদ, শত্রুতা থেকে রক্ষা পেতে পারে *(তাফসীরে ইবনুল কাইয়েম, ৫৮৭ পৃঃ)*।

৫. ইবনুল কাইয়েম বলেন, তাওয়াক্কুল হল ঈমানের অর্ধেক। কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া ঈমানের বাকী অর্ধেক। আর দ্বীন হল আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ও আল্লাহ্র ইবাদত করা। তাওয়াক্কুল হল সাহায্য প্রার্থনা এবং কর্ম হল ইবাদত *(মাদারিজুস সালেকীন ২/১১৮ পৃঃ)*।

সারবস্তু

১. তাওয়াক্কুল হল ঈমানের পূর্ণতা এবং ইসলামের সৌন্দর্য।

২. তাওয়াক্কুল আল্লাহ্র ভালবাসা, সাহায্য ও বিজয় অর্জনের মাধ্যম।

৩. তাওয়াক্কুল অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি দান করে বাস্তববাদী হতে শেখায়।

৪. আল্লাহ্র প্রতি ভরসা মানুষকে জীবনের মৌলিক লক্ষ্যের উপর অটল রাখে।

সঠিক আক্বীদা পোষণ না করার পরিণাম

মুযাফফর বিন মুহসিন

মুসলিম জীবন আক্বীদার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আক্বীদা বা বিশ্বাস যার বিশুদ্ধ নয় তার জীবন সম্পূর্ণটাই বৃথা। কারণ বিশুদ্ধ আক্বীদা মুসলিম জীবনের মূল চাবিকাঠি। বিশ্বাসের আলোকেই মানুষ তার সকল কর্ম সম্পাদন করে থাকে। 'আল-আক্বীদাহ' শব্দটি উক্বদাতুন শব্দ থেকে উদ্‌গত। অর্থ- গিরা বা বাঁধন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'উক্বদাতুন নিকাহ' বা বিবাহের বাঁধন *(বাক্বারাহ ২৩৫ ও ২৩৭)*। বাঁধনের মাঝে কী আছে তা না দেখেই শুধু শুনে চূড়ান্ত বিশ্বাস করার নাম আক্বীদা। কর্ম ছাড়া কোন বিষয়ে সন্দেহাতীত চূড়ান্ত বিশ্বাসই আক্বীদাহ। তাই আল্লাহকে না দেখে, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, ক্বিয়ামত, কবরের আযাব ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয় না দেখে শুধু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনায় দৃঢ় বিশ্বাস করার নাম আক্বীদা। আর এই আক্বীদার উপরই যাবতীয় আমল নির্ভরশীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' *(ছহীহ বুখারী হা/১; ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৬; মিশকাত হা/১)*।

উক্ত 'নিয়ত' শব্দটি 'নাওয়া' (نواة, نوى) শব্দ থেকে উদ্ভূত। অর্থ- বিচি বা আঁঠি। অর্থাৎ মনের গহীনে যে আঁঠি লাগানো হবে, ঠিক তারই গাছ হবে এবং ফলও সেই গাছেরই হবে। আক্বীদা বা নিয়ত যার যেমন হবে আমল তেমনই হবে। তার বিপরীত হবে না। কারণ কাঁঠালের বিচি লাগালে আম হয় না। অনুরূপ আমের আঁঠি লাগালে কাঁঠাল হয় না। সুতরাং কলবের কল্পনার ভিত্তি আক্বীদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সবই বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) এক হাদীছে বলেন, أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ. 'সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মাঝে একটি টুকরা আছে। যদি সেই টুকরাটি সুস্থ থাকে, তাহলে পুরো শরীরটাই সুস্থ থাকে। আর যদি ঐ টুকরাটি অসুস্থ থাকে, তাহলে পুরো শরীরটাই অসুস্থ থাকে। সাবধান! আর সেটাই হল কলব *(ছহীহ বুখারী হা/৫২; ছহীহ মুসলিম হা/৪১৭৮, 'মুসাক্বাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২০; মিশকাত হা/২৭৬২)*। সুতরাং এই কলব সঠিকভাবে পরিচালিত হলে শরীরের হাত-পা, চোখ-কান, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, চলা-ফেরা সবই সঠিক পথে পরিচালিত হবে। অন্যথা কোনটিই সোজা পথে পরিচালিত হবে না। অন্য হাদীছে রয়েছে, عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে দেখবেন না; বরং তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর ও আমল সমূহের দিকে *(ছহীহ মুসলিম হা/৬৭০৮; মিশকাত হা/৫৩১৪)*।

বিশুদ্ধ আক্বীদা ব্যতীত কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয় :

মুসলিম ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল নিজের আক্বীদাকে পরিশুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে কুফরী করবে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫)*। উক্ত আয়াতকে সামনে রেখে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম বলেন, مَعْلُوْمٌ بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْأَعْمَالَ وَالْأَقْوَالَ إِنَّمَا تَصِحُّ وَتُقْبَلُ إِذَا صَدَرَتْ عَنْ عَقِيْدَةٍ صَحِيْحَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْعَقِيْدَةُ غَيْرَ صَحِيْحَةٍ بَطَلَ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْهَا. 'শারঈ বিধি-বিধান তথা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যাবতীয় আমল ও কথা কেবল তখনই বিশুদ্ধ হবে এবং গৃহীত হবে, যখন তা বিশুদ্ধ আক্বীদার মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। আর যদি আক্বীদা বিশুদ্ধ না হয় তবে তার থেকে যা কিছু বের হবে সবই বাতিল বলে গণ্য হবে'। এজন্য বলা হয়, اَلْعَقِيْدَةُ الصَّحِيْحَةُ هِىَ أَصْلُ دِيْنِ الْإِسْلاَمِ وَأَسَاسُ الْمِلَّةِ 'বিশুদ্ধ আক্বীদা দ্বীন ইসলামের মূল এবং মুসলিম মিল্লাতের সুদৃঢ় ভিত্তি' *(শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, আল-আক্বীদাতুছ ছহীহাহ ওয়ামা ইউযাদ্দুহা (রিয়ায : দারুল ক্বাসেম, ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ৩ ভূমিকা দ্রঃ)*।

সমাজে আমলের গুরুত্বই বেশী। কিন্তু বিশুদ্ধ আক্বীদার কোন গুরুত্ব নেই। অথচ আমল যতই সুন্দর হোক আক্বীদা ছহীহ না হলে তা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোন আমল কবুল করবেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ হৃদয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য না হয় *(নাসাঈ হা/৩১৪০, সনদ ছহীহ)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) আক্বীদাভ্রষ্ট আমলকারীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যেমন- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِى النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِى الْقِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِى الرِّيْشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِى الْفُوْقِ. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্য হতে একটি সম্প্রদায় বের হবে যাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে, ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের ছিয়ামকে এবং আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তোমরা হালকা মনে করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন ইসলাম থেকে অনুরূপভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে শিকার ভেদ করে তীর বেরিয়ে যায়। শিকারী তীরের ফলার দিকে তাকায় কিন্তু তাতে শিকারের কোন অংশ দেখতে পায় না, সে তীরের পার্শ্ব ও পাতার দিকে তাকায় কিন্তু সেখানেও কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে সে তীরের ফলার মাথায় কিছু আছে মনে করে সন্দেহ পোষণ করে

(ছহীহ বুখারী হা/৫০৫৮; মিশকাত হা/৫৮৯৪)। অন্যত্র রয়েছে, শেষ যামানায় তারা পূর্ব দিক থেকে বের হবে। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি তাদেরকে পেলে আদ জাতির ন্যায় হত্যা করব *(ছহীহ বুখারী হা/৬৯৩০ ও ৭৫৬২)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, ইয়ামান থেকে গনীমতের মাল আসলে রাসূল (ছাঃ) তা বন্টন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় বনী তামীম গোত্রে যুল খুওয়াইছিরা নামে এক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলে, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি ইনছাফ করুন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, ধিক তোমাকে! আমিই যদি ইনছাফ না করি তবে আর কে ইনছাফ করবে? অন্যত্র এসেছে, **فَمَنْ يُطِيْعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنِّى عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُوْنِىْ** 'আমি যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করি তাহলে তাঁর আনুগত্য করবে কে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর উপর আমানতদার করেছেন আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করবে না? *(ছহীহ বুখারী হা/৭৪৩২)*। অন্য বর্ণনায় আছে, **أَلاَ تَأْمَنُوْنِىْ وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأْتِيْنِىْ خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً.** 'তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করবে না? অথচ যিনি আসমানে আছেন আমি তাঁর পক্ষ থেকে আমানতদার। আমার কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আসমানের খবর আসে *(ছহীহ বুখারী হা/৪৩৫১)*। এই আক্বীদার লোকই শেষ যামানায় আবির্ভাব হবে।

উক্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা থাকার কারণেই তাদের ছালাত, ছিয়ামসহ যাবতীয় সুন্দর আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এজন্য তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বহিস্কৃত হবে যে, তাদের সাথে ইসলামের কোন অংশ থাকবে না।

সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ :

(১) আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ্‌র আকার ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে যা বলা হয়েছে সেগুলোর অর্থ তাঁর কুদরত।

(২) ঈমান বাড়েও না কমেও না।

(৩) মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরি। তিনি মারা যাননি, বরং ইন্তিকাল করেছেন মাত্র। তিনি কবরে জীবিত আছেন এবং মানুষের আবেদন শুনেন ও পূরণ করে থাকেন। অর্থাৎ হায়াতুন্নবীতে বিশ্বাস করা।

(৪) ওলী-আওলিয়া, পীর-দরবেশ কখনো মরেন না। তারা দুনিয়া থেকে কবরে স্থানান্তরিত হন মাত্র। তারা কবর থেকেই মানুষের উপকার ও ক্ষতি করে থাকেন। এ জন্য তাদের কবরের নিকটে গিয়ে সাহায্য চাওয়া, মানত করা, সিজদা করা।

(৫) মৃত ব্যক্তির স্মরণে বিভিন্ন প্রতিকৃতি, খাম্বা, মূর্তি, ভাস্কর্য, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ ইত্যাদি নির্মাণ করা এবং মাগফিরাত কামনার্থে সেখানে ফুল দেওয়া, নীরবতা পালন করা, মাথা নত করা।

(৬) বৈষয়িক জীবনে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। ধর্মীয় জীবনের জবাবদিহিতা আছে তবে বৈষয়িক জীবনের কোন জবাবদিহিতা নেই। অতএব ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যদি সম্পর্কে আল্লাহ হিসাব নিবেন। তবে বৈষয়িক জীবনে রাজনীতি, অর্থনীতির নামে সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, হত্যা-গুম, চুরি-ব্যভিচার, লুণ্ঠন-আত্মসাৎ, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি করলেও আল্লাহ এগুলোর কোন হিসাব নিবেন না।

(৭) মাযহাব চারটি। হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বালী। এগুলোর অনুসরণ করা ফরয। চার ইমাম যা বলে গেছেন সবই সঠিক। তারা কোন ভুল করে যাননি। এর বাইরে শরী'আত তালাশ করা যাবে না।

(৮) পীর ধরা ফরয। পীরের মুরীদ না হলে জান্নাত পাওয়া যাবে না। যার পীর নেই শয়তান তার পীর।

(৯) ১৫ শা'বান শবেবরাত বা সৌভাগ্যের রজনী। এই রাত্রে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়। সে লক্ষ্যে উক্ত রাতে উন্নত খাবার খাওয়া, ইবাদত করা ও দিনে ছিয়াম পালন করা।

(১০) বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য জন্ম দিবস ও মৃত্যু দিবস, উরস অনুষ্ঠান করা। রাসূল (ছাঃ)-এর নামে তাঁর জন্ম দিনে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা, মীলাদ অনুষ্ঠানে রাসূলের আগমন উপলক্ষ্যে ক্বিয়াম করা ও সজ্জিত আসন রাখা।

(১১) হাদীছ যঈফ ও জাল হয় না। দুর্বল হাদীছ থাকলেও তার উপর আমল করা যাবে।

(১২ পরকাল বলতে কিছু নেই। দুনিয়াই মানুষের শেষ ঠিকানা।

(১৩) স্রষ্টা বলতে কিছু নেই। প্রকৃতিই সবকিছুর স্রষ্টা

উক্ত আক্বীদাগুলো সবই ভ্রান্ত ও মিথ্যা। এর মধ্যে প্রায়ই শিরকী আক্বীদা। সমাজে এধরনে অসংখ্য ভ্রান্ত বিশ্বাস চালু আছে। হৃদয়ে এই আক্বীদা নিয়েই ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি করছে। আর মনে করা হচ্ছে তা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হচ্ছে। অথচ আক্বীদার মানদণ্ডে তার কোন মূল্য নেই। এজন্য মুছল্লীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, হাজ্জী ও দানবীরের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, আত্মসাৎ, মওজুদদারী, মোনাফাখরী, প্রতারণাও বেড়ে চলেছে। অতএব বিশুদ্ধ আক্বীদা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই অত্যাবশ্যক। আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ধারণ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

কুরআন শিক্ষা : ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

হোসাইন আল-মাহমূদ

আসমান-যমীনের মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির জন্য যে দ্বীনকে মনোনীত করেছেন–তাই হল ইসলাম। পবিত্র কুরআন হল এই দ্বীনের শাশ্বত সংবিধান। মানবজাতির চিরন্তন গাইডলাইন। এই গাইডলাইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা এবং মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই আল্লাহ মুসলিম জাতির উত্থান ঘটিয়েছেন। এই চিরন্তন গাইডলাইনই মানবজাতির দুনিয়াবী ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা-ব্যর্থতার একমাত্র মাপকাঠি। এজন্য কুরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত অপরিহার্য এবং ফরয দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার যে, কুরআনের মর্যাদা অনুধাবনে ব্যর্থ হবার কারণেই হোক আর মরীচিকাময় দুনিয়াবী জীবনে শয়তানের ফেরেবে পড়ে হোক, পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং অনুশীলন থেকে অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত গাফেল। এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে শতকরা কতজন সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানেন, যারা জানেন তাদের কতজন নিয়মিত পড়েন, যারা পড়েন কতটুকু অর্থ বুঝে পড়েন–এ সকল পরিসংখ্যান অনুসন্ধান করলে বড় ধরনের এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্রই যে ফুটে উঠবে, তা বিনা গবেষণায় বলে দেয়া যায়। মুসলিম জাতি হিসাবে এটা আমাদের জন্য কতটা বিপজ্জনক ও লজ্জাজনক হতে পারে তা সমাজের মানুষের ভয়াবহ আক্বীদা-আমলগত ত্রুটি-বিচ্যুতিই বলে দেয়। অত্র নিবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে পবিত্র কুরআনের বিশেষত্ব, কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত এবং কুরআন তেলাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

কুরআনের পরিচয় :

কুরআন শব্দটির ক্রিয়ামূল হল–قرأ । যার আভিধানিক অর্থ–পাঠ করা বা একত্রিত করা। সেই হিসাবে কুরআন শব্দের অর্থ হয়–যা পাঠকৃত বা একত্রিত। আর পরিভাষায়–আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার নামই আল-কুরআন।

কুরআনের বর্ণনায় কুরআনের পরিচয় :

পবিত্র কুরআন স্বয়ং নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেছে এভাবে–

- 'এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত' *(বাক্বারা ২)*।
- 'আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্যকারী ও রহমতস্বরূপ' *(বনী ইসরাঈল ৮২)*।
- 'ইহা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল একক ইলাহ। আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ইবরাহীম ৫২)*।
- 'বল, 'যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়' *(নিসা ৮৮)*।
- 'এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণগুলি পেশ করি; হয়ত তারা চিন্তাভাবনা করবে' *(হাশর ৮১)*।

কুরআনের বিভিন্ন নাম :

কুরআনের বেশ কিছু নাম রয়েছে। যেমন– হুদা (পথনির্দেশক), যিকর (উপদেশ বাণী), ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী), নূর (আলো), বুরহান (প্রমাণ), হাকীম (মহা জ্ঞানপূর্ণ), ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا 'তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) নাযিল করেছেন যেন তা জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে' *(ফুরকান ১)*।

পবিত্র কুরআনের বিশেষত্বসমূহ :

১. কুরআন আল্লাহ প্রেরিত কিতাব : আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবতার হেদায়াতের জন্য যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আল-কুরআন হল সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'নিশ্চয় এ কুরআন বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে *(শু'আরা ১৯২)*।

২. কুরআন হল নূর বা আলো : অজ্ঞতার নিকষ কৃষ্ণাধারে দিকভ্রান্ত মানবজাতিকে পথের সন্ধান দেয়ার জন্য চিরন্তন দেদীপ্যমান আলোকবার্তা বা নূর হল আল-কুরআন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে এবং নিজ অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়াত দেন' *(মায়িদাহ ১৫-১৬)*।

৩. কুরআন মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক : মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন – وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 'আমি তোমার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা সহকারে। আর এটা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ' *(নাহল ৮৯)*।

৪. কুরআন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত : পবিত্র কুরআন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এবং অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'নিশ্চয় আমি উপদেশবাণী তথা কুরআন নাযিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে এর হেফাযতকারী আমি নিজেই' *(হিজর ৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 'তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত' *(নিসা ৮২)*।

৫. কুরআন রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে : পবিত্র কুরআন রামাযান মাসের লাইলাতুল ক্বদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيه الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَات مِنَ الْهُـدَى وَالْفُرْقَـان 'রামাযান এমন মাস যাতে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়েত ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এবং হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্যবিধানকারী' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*।

৬. কুরআন মুমিনদের জন্য রহমত : কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে নাযিল করা হয়েছে। যারা এ কুরআন পড়বে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে তারা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 'আর আমি কুরআন নাযিল করেছি যা মুমিনদের জন্য শেফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়' *(বনী ইসরাঈল ৮২)*।

৭. কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস : কুরআন মাজীদ সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এতে বর্ণিত সবকিছুই সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِـيمِ 'ইয়া-সীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ' *(ইয়াসীন ১-২)*। بَلْ هُـوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 'বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা (কুরআন) সুস্পষ্ট নিদর্শন *(আনকাবুত ৪৯)*।

৮. কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ : কুরআনের মত কোন কিতাব মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। প্রায় পনেরশত বছর পূর্বের এই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ সক্ষমও হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِـيرًا 'বল, যদি মানব ও জ্বিন জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছু আনয়ন করবে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছুই আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়' *(বনী ইসরাঈল ৮৮)*।

৯. কুরআন জীবন্ত মু'জিযা : মক্কার কাফের-মুশরিকরা যখন রাসূল (ছাঃ)কে তাঁর নবুয়তের সত্যতা স্বরূপ মু'জিযা দেখাতে বলল, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَـيْهِمْ 'তাদের জন্য (কাফেরদের) এই কিতাবই কি (মু'জিযা হিসাবে) যথেষ্ট নয়, যা তাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়? অর্থাৎ এই কুরআন নিজেই তো একটি জীবন্ত মু'জিযা এবং নবুওতের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ মানবজাতির জন্য।

১০. কুরআন শিক্ষা সহজ : কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জ্ঞানলাভের জন্য সহজতর করে দিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণা– وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 'আর আমি তো কুরআন শেখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশগ্রহণকারী আছে কি?' *(আল-ক্বামার ১৭)*।

কুরআনের প্রতি মানুষের হক্ব :

পবিত্র কুরআন কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়। এটা এমন এক গ্রন্থ যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্ব মানবতার হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতএব কুরআনের প্রকৃত হক্ব আদায় করার জন্য মানুষের উপর অবশ্য পালনীয় কিছু কর্তব্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

১. কুরআন শিক্ষা ফরয : প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যে নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করবে, তাকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা করা ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّـذِي خَلَقَ 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক ১)*। আল্লাহ আরো বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 'আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে *(ছোয়াদ ২৯)*।

উম্মতকে কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تعلمـوا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القـرآن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهى به ورجل يستأكل به ورجل يقـرأه لله 'তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং কুরআনকে আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাত লাভের অসীলা বানিয়ে নাও, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থে কুরআন শিখবে। কেননা তিন প্রকার মানুষ কুরআন শিক্ষা করে–(১) ঐ ব্যক্তি যে তা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করে। (২) ঐ ব্যক্তি যে তা দিয়ে পেট চালাতে চায়। (৩) যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই তা পাঠ করে *(বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৮)*।

তিনি আরো বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُـرْآنَ وَعَلَّمَـهُ 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে কুরআন নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী, মিশকাত ২১০৯)*।

২. কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া : কুরআন শুধু শিক্ষা করাই যথেষ্ট নয়; বরং কুরআনের শিক্ষাকে নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি? كان خلقه القرآن 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন' *(আহমাদ হা/২৪৬৪৫)*। আলী (রাঃ) বলেন, اعْمَلُوا بِه ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ 'হে কুরআন বহনকারী! বা হে জ্ঞানী! তুমি কুরআনের উপর আমল কর, কেননা ইলম আমলের উপর নির্ভরশীল। কুরআনের ইলমের সাথে তোমার আমলকে মিলিয়ে নাও। কেননা অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের অবির্ভাব হবে যারা জ্ঞানের অধিকারী হবে বটে; কিন্তু তাদের জ্ঞান তাদের কণ্ঠনালীও অতিক্রম করবে না' *(দারেমী হা/৩৮২, সনদ ত্রুটিযুক্ত)*।

৩. কুরআনের শিক্ষাকে প্রচার করা : কুরআনের শিক্ষাকে প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَـا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ 'হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ হতে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন এবং যদি আপনি না করেন তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না *(মায়েদা ৬৭)*।' এ নির্দেশের আলোকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কুরআনের প্রচার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। উম্মতকেও এ দায়িত্ব পালনের জন্য জোর তাক্বীদ দিয়ে তিনি বলেন, بَلِّغُوا عَنِّـي وَلَـوْ آيَـةً 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে (আল্লাহ্‌র বাণী) পৌঁছিয়ে দাও, যদি একটি আয়াতও হয় (তবুও)' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

৪. কুরআন নিয়মিত তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াত একটি বড় ইবাদত। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বহু স্থানে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত নিয়ে আলোচিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকতেন। আবু হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাতের ছালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি এক রাক'আতেই সূরা বাক্বারা, আলে ঈমরান ও নিসা পড়েন *(নাসাঈ হা/১০০৯, ছহীহ)*। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ– قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا– نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا– أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, তবে কিছু অংশ ব্যতীত। রাতের অর্ধেক কিংবা তারচেয়ে কিছুটা কম কর। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত কর *(মুযযাম্মিল ১-৪)*।

কুরআনকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা : কুরআনকে অবশ্যই কুরআনের মর্যাদা দিতে হবে। কুরআনকে সর্বদা উঁচু স্থানে রাখতে হবে। কেননা কুরআন অন্যান্য গ্রন্থের মত নয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 'যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই' *(হজ্জ ৩২)*। সুতরাং কিতাব খোলা রেখে গল্পগুজব করা বা উঠে যাওয়া অসম্মানজনক কাজ। মানুষের হৈ-হল্লা হয় এমন স্থানেও কুরআন তেলাওয়াত বাজানো ঠিক নয়। কিতাবের পৃষ্ঠা মুড়া বা অহেতুক দাগাদাগি করাও ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর' *(আ'রাফ ২০৪)*।

কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতের ফযীলত :

১. কুরআন তেলাওয়াত এক চিরস্থায়ী লাভজনক ব্যবসা : কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর সাথে বান্দার একটি লাভজনক ব্যবসা। বিভিন্ন ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দুটিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখানে লাভ ছাড়া কোন প্রকার ক্ষতির অংশ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 'যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার, যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(ফাতির ২৯-৩০)*।

২. অফুরন্ত ছওয়াব অর্জন : কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিরাট ছওয়াব অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এর সাথে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকী প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)*।' এছাড়া নির্ধারিত সময় ও দিনে কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঠে বহু ফযীলত নিহিত রয়েছে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবারে সূরা কাহাফ পড়ে, তবে তা পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকু তার জন্য আলোকিত করে রাখে (অর্থাৎ তার ছওয়াব ও কল্যাণ সে লাভ করে) *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৭৫, হাসান)*।

৩. কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সর্বোত্তম ব্যক্তি : কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভূত কল্যাণ অর্জন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী, মিশকাত ২১০৯)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشُقُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ 'কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্যবান, সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে বারবার চেষ্টা করে কুরআন পড়ে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*।

৪. কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে : 'কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে। এটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*।

৫. কুরআন পড়া উত্তম সম্পদ অর্জন : কুরআন পড়া বা শিক্ষা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকা পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ অর্জন করার সমতুল্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কেন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কুরআন হতে দুটি আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না? তাহলে সেটি তার জন্য দুটি উট লাভ করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি আয়াত চার উট অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০)*।

৬. কুরআন তেলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধি করে : কুরআন তেলাওয়াত বান্দাহ্র জন্য এমন উপকারী যে, তা তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 'মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে' *(আনফাল ২)*। কুরআনে আরো এসেছে, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ 'যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই এর প্রতি ঈমান এনেছে' *(বাক্বারা ১২১)*।

৭. কুরআন শিক্ষা অন্তরের প্রশান্তি : মানব জীবনে অর্থ বা অন্যান্য কারণে জাগতিক তৃপ্তি আসলেও প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তি লাভ কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 'যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায় *(রা'দ ২৮)*।

৮. কুরআনের ধারক-বাহক ঈর্ষণীয় ব্যক্তি : কোন ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তার হক আদায় করে তেলাওয়াত করলে তার সাথে ঈর্ষা করা যাবে অর্থাৎ তার মত হওয়ার আকাঙ্খা করা যাবে, যাকে গিবতাহ বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ 'একমাত্র দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা-রাত্রি ঐ কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে...*(মুত্তাফাক আলাইহ হা/২০২)*।

৯. জান্নাত লাভ : প্রত্যেক মুমিনের সর্বোচ্চ কামনা হল জান্নাত লাভ। কুরআন শিক্ষা করা মানুষের জন্য জান্নাত লাভের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَان للْعَبْد يَوْمَ الْقيَامَة -- وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ باللَّيْلِ فَشَفِّعْني فيه قَالَ فَيُشَفَّعَان 'ছিয়াম ও কুরআন কিয়ামাতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে...কুরআন বলবে, হে আমার রব! আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩)*।

কুরআন শিক্ষা না করার পরিণতি :

১. রাসূল (ছাঃ)-এর অভিযোগ পেশ : কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে রাসূল (ছাঃ) উম্মাতের জন্য শাফা'আত করবেন। কিন্তু যারা কুরআন শিক্ষা করেনি, কুরআনের যেসব হক্ব রয়েছে তা আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন নবী (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করবেন। কুরআনে এসেছে, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا 'আর রাসূল বলবেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে' *(ফুরক্বান ৩০)*। ইবন কাছীর বলেন, কুরআন না পড়া, তা অনুসারে আমল না করা, তা থেকে হেদায়াত গ্রহণ না করা, এ সবই কুরআন পরিত্যাগ করার শামিল *(৬/১৮৮ পৃঃ)*।

২. কিয়ামত দিবসে অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে : যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে থাকল, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى 'আর যে আমার যিকর (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন? তিনি বলবেন, অনুরূপভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল' *(ত্বহা ১২৪-১২৬)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا 'আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায়, বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখন জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নির দাহিকাশক্তি আরও বাড়িয়ে দেব' *(বনী-ঈসরাইল ৯৭)*।

৪. গাফেল হিসাবে চিহ্নিত হবে : কুরআন শিক্ষা না করা ব্যক্তি গাফেল। কুরআনের ভাষায় তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত অজ্ঞানতা ও মূর্খতার মাঝে নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 'এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা তাদের চেয়েও আরো অধম ও নিকৃষ্ট। এরাই হল গাফেল' *(আ'রাফ ১৭৯)*।

৫. কুরআন বিরোধী দলীল হিসাবে উপস্থাপিত হবে : কুরআন শিক্ষা থেকে বিরত থাকার কারণে কুরআন তার বিপক্ষের দলীল হিসাবে উপস্থিত হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ 'কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষের দলীল *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)*।

৬. জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে : কুরআন শিক্ষা না করা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّة ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِه قَادَهُ إِلَى النَّار 'কুরআন সুপারিশকারী এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। কুরআন বিতর্ককারী এবং তার বিতর্ক সত্যায়ন করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রেখে তাঁর অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে' *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১২৪)*।

৭. আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে : কুরআন শিক্ষা না করলে এ বিষয়ে আখেরাতে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ 'নিশ্চয় এ কুরআন তোমার জন্য এবং তোমার কওমের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে *(যুখরুফ ৪৪)*।

কুরআন তেলাওয়াতের আদব :

১. প্রাথমিক আদব : কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে ইখলাসের সাথে পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ মন নিয়ে। 'মাছহাফ' নিয়ে বসলে অযু করে পবিত্র হয়ে বসাটাই সর্বোত্তম, কেননা কুরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। তবে অযু না থাকলেও প্রয়োজনে মাছহাফ স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে (অপবিত্র অবস্থায় না থাকলে)। তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম' পাঠ করে শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাইতে হবে *(নাহল ৯৮)*। অতঃপর কোন সূরার শুরু থেকে হলে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে, নতুবা 'আউযুবিল্লাহ'ই যথেষ্ট। মসজিদে বা পবিত্র কোন জায়গায় বসে তেলাওয়াত করতে হবে। তবে এমনিতে দাড়িয়ে, শুয়ে, আরোহী হয়ে সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায় *(আলে ঈমরান ১৯১)*।

২. তেলাওয়াতের সময় অন্তরকে একনিষ্ঠ করতে হবে : তেলাওয়াত করার সময় অন্তরকে আল্লাহ্‌র দিকে একনিষ্ঠভাবে রুজূ' করে দিতে হবে। কেননা ইবাদতের মূল হল খুলূছিয়াত বা একনিষ্ঠতা *(বাইয়েনাহ ৫, ফুছছিলাত ১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا به اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ منْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ 'তোমরা কুরআন পড় এবং এর বিনিময় আল্লাহ্‌র কাছে কামনা কর, ঐ সম্প্রদায় আসার পূর্বেই, যারা কুরআনকে তীর রাখার মত করে রাখবে। তারা কুরআন থেকে পরকালীন লাভের পরিবর্তে দুনিয়াবী লাভ আশা করবে *(আহমাদ হা/১৪৮৫৫, ছহীহ)*।

৩. কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে তাজবীদ সহকারে : কুরআন ধীরে-সুস্থে তারতীলসহ পড়া অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'এবং তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তারতীল সহকারে' *(মুযাম্মিল ৩)*। রাসূল (ছাঃ) ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করতেন, কোন তাড়াহুড়া করতেন না *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, زيّنوا القرآن بأصواتكم 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর সুন্দর কণ্ঠে *(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/২১৯৯, ছহীহ)*। বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত আর শুনিনি *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৪)*। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে বালুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে না আবার সঙ্গীতের মত উচ্চ বা হ্রস্ব সুরে ঝুলিয়ে পড়বে না বরং পড়ার সময় কুরআনের মু'জিযাকে থেমে থেমে অনুধাবন করবে এবং অন্তরকে আন্দোলিত করে পড়বে।

৪. অর্থ বুঝে পড়তে হবে : পবিত্র কুরআন বুঝে পড়া আবশ্যক। কারণ কুরআন নাযিল করা হয়েছে যেন জ্ঞানীরা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে। পবিত্র কুরআনে বারবার কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে। অর্থ না বুঝলে অনুবাদের সহযোগিতা নিয়ে যথাসম্ভব বুঝার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা কুরআন নাযিলের মৌলিক উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছাহাবায়ে কেরাম সাধারণতঃ দশটি আয়াতও অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ তাতে কি রয়েছে তা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ না করতেন এবং তা আমলে পরিণত না করতেন। রাসূল (ছাঃ) কুরআন তেলাওয়াত করার সময় এতটাই একনিষ্ঠতা নিয়ে পড়তেন যে, যখন কোন তাসবীহের আয়াত আসত, তিনি মনে মনে তাসবীহ পড়তেন; প্রার্থনার আয়াত আসলে প্রার্থনা করতেন এবং আশ্রয় প্রার্থনামূলক আয়াত আসলে আশ্রয় চাইতেন *(নাসাঈ হা/১৬৬৪, ছহীহ)*।

৫. অন্তরকে বিগলিত করে পড়তে হবে : কুরআন তেলাওয়াতের সময় রাসূল (ছাঃ) এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন যে, কান্নায় তার বক্ষদেশ থেকে ফুটন্ত পানির মত শব্দ হত *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০০)*। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ 'আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুসজল হচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে *(মায়েদা ৮৩)*।'

৬. তেলাওয়াত শ্রবণে একাগ্রতা : রেডিও-টিভিতে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সময় গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে তা শুনতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে একদিন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। আমি বললাম, আপনার উপরই কুরআন নাযিল হয়েছে, আর আমি আপনাকে পড়িয়ে শোনাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি অন্য কারো কাছ থেকে কুরআন পড়া শুনতে ভালবাসি। অতঃপর আমি সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। যখন আমি ৪৪ নং আয়াতে পৌঁছলাম, রাসূল (ছাঃ) আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম, আয়াতটি শ্রবণে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দনধারা ঝরছে *(বুখারী, মিশকাত হা/২১৯৫)*।

কুরআন শিক্ষার জন্য করণীয় :

ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করা অত্যন্ত যরূরী। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত জানা মানুষের সংখ্যা খুবই কম, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমাদের যথেষ্ট অবহেলারই পরিচায়ক। ভালভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারি।

১. ভাল শিক্ষকের কাছে পড়া : যিনি ছহীহভাবে কুরআন পড়তে পারেন তার নিকটই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে যে শিক্ষকের কুরআন শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে তার কাছে পড়লে আরো ভাল হয়।

২. নিয়মিত পড়া : ছহীহভাবে কুরআন শিক্ষার জন্য নিয়মিত সময় দেয়া দরকার। যদিও কম সময় হয়। প্রতিদিন শেখার মধ্যে থাকলে ছহীহভাবে কুরআন শিক্ষা সহজ হবে এবং যা শেখা হবে তা আয়ত্বে থাকবে।

৩. নিয়মিত মশক বা অনুশীলন করা : কোন যোগ্য শিক্ষকের কাছে মশক করলে পড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। মশক হলো- শিক্ষক পড়বে তারপর সেভাবে ছাত্রও পড়বে। এ ছাড়া বিভিন্ন সিডির মাধ্যমেও মশক করা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী মিনশাভীর কুরআন প্রশিক্ষণ সিডির সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৪. পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের শিক্ষা দেয়া : প্রত্যেক মুসলিমকে তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআনে এসেছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম ৬)*। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, عَلَيْكُم بِالْقُرْآنِ ، فَتَعَلَّمُوه وَعَلِّمُوه أَبْنَائكُم ، فَإِنَّكُم عَنْه تُسْأَلُوْن ، وَبِه تُجْزَوْن 'কুরআনের বিষয়ে তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় এই যে, কুরআন শিক্ষা করা এবং তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। কেননা এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেয়া হবে' *(ইবনু বাত্তাল, শরহে সহীহ বুখারী, ১০/২৬৬ পৃঃ)*।

৫. ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো বেশী বেশী পড়া : ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি তিলাওয়াত করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رسولَ الله ؟ فَقَالَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ: ثُلُثُ الْقُرْآنِ 'তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতে সক্ষম? তারা বিষয়টি কঠিন মনে করলেন এবং বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়বে? তিনি বললেন, (সূরা ইখলাছ) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*।

অতএব যেসব সূরা ও আয়াত সম্পর্কে অধিক ফযীলত ও বেশি নেকীর কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ভালোভাবে শেখা ও বেশি বেশি পড়া দরকার। এর মধ্যে রয়েছে, সূরা বাক্বারা, সাজদাহ, দাহর, ওয়াক্বিয়া, রহমান, ইয়াসীন, মুলক, আ'লা, গাশিয়া, ইখলাছ, ফালাক, নাস, আয়াতুল কুরসী প্রভৃতি।

শেষকথা :

এ কথা সকল মুসলিমের জানা উচিৎ, কেবলমাত্র মুসলিম হওয়াই জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ইসলামী জীবনবিধানকে অনুসরণ করতে হবে অনুসরণ করার মত। তবেই কেবলমাত্র সফলতা আসতে পারে। আল্লাহ বলেন, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى 'অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না' *(ত্বহা ১২৩)*।

ইসলামকে অনুসরণের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ জ্ঞান। বিশুদ্ধ জ্ঞানের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। সুতরাং ইহলৌকিক জীবনে সুপথ প্রাপ্ত হওয়া এবং পারলৌকিক জীবনে মুক্তিলাভের জন্য আমাদেরকে মানবজাতির উদ্দেশ্যে মহান রাব্বুল আলামীন প্রেরিত এই মহা হেদায়েতগ্রন্থ পবিত্র কুরআনকে যে কোন মূল্যে শিখতে হবে। কুরআনের নির্দেশাবলী জানতে হবে। নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব।

অতএব প্রিয় যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক আহবান, এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পরিসমাপ্তির পর যে অন্তহীন জীবন আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে সে জীবনে আমাদের একমাত্র সাথী হবে পবিত্র কুরআন। এই চিরস্থায়ী সাথীকে তাই সময় থাকতেই যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। সুতরাং আসুন! সাধ্যমত কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। আমাদের আত্মীয়-পরিজন এবং সমাজকে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সময় আবশ্যকভাবে কুরআনের জন্য ব্যয় করি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন। আমীন!

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারত উপ-মহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে আরব বণিকদের মাধ্যমে, এসব এলাকায় বসতি স্থাপনকারী আরব মুসলিমদের মাধ্যমে, খিলাফতে রাশিদার সময় হ'তে ক্রমাগত রাজনৈতিক অভিযান সমূহের মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে আগত ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈ বিদ্বানদের নিরন্তর দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে। সেই হ'তে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশে মুসলমানের বসবাস রয়েছে এবং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও তাদের আকীদা ও আমলে এসেছে বহু পরিবর্তন, কুরআন ও সুন্নাহ্র স্বচ্ছ সলিলে ঘটেছে বহু মতের সংমিশ্রণ।

একথা অনস্বীকার্য যে, ছাহাবায়ে কেরামই ছিলেন ইসলামের বাস্তব নমুনা। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তাঁদের সার্বিক জীবন পরিচালিত হ'ত। পরবর্তী যুগে সৃষ্ট মাযহাবী দলাদলি হ'তে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। উদ্ভূত কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা কুরআন ও হাদীছ থেকে সিদ্ধান্ত তালাশ করতেন। না পেলে ছাহাবীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (ইজমা) অনুসন্ধান করতেন। সেখানেও না পাওয়া গেলে কুরআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতির আলোকে 'ইজতিহাদ' করতেন। পরবর্তীতে কোন ছহীহ হাদীছ অবগত হ'লে ইতিপূর্বেকার গৃহীত ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতেন। কোনরূপ ব্যক্তিগত বা দলীয় যিদ ও অহমিকা তাঁদেরকে হাদীছের অনুসরণ হ'তে বিরত রাখতে পারতনা। তাঁরা ছিলেন সুন্নাতের হেফাযতকারী, হাদীছের প্রচারক ও নিরপেক্ষ অনুসারী। তাঁরা হাদীছের প্রচলিত ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতেন। কোনরূপ দূরতম সম্ভাবনা ব্যক্ত করে 'তাবীল'-এর আশ্রয় নিতেন না। মোটকথা জীবন সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীছ হ'তে গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা সদা সচেষ্ট থাকতেন। আর এজন্য তাঁরা যথার্থভাবেই নিজেদেরকে 'আহ্লুল হাদীছ' নামে অভিহিত করতেন এবং প্রথম শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে সৃষ্ট খারেজী, শী'আ, মুর্জিয়া, জাব্রিয়া, ক্বাদারিয়া প্রভৃতি বিদ'আতী ফের্কাসমূহ হ'তে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতেন। তাবে-তাবেঈগণও এই তরীকার অনুসারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী এ ব্যাপারে স্মরণযোগ্য- 'শ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, তারপর পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের...।'-ছাহাবীদের যুগ ১০০ বা ১১০ হিজরী, তাবেঈদের যুগ ১৮০, তাবে-তাবেঈদের যুগ ছিল ২২০ হিজরী পর্যন্ত।

একথা বলা চলে যে, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের স্বর্ণযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের হাতে বিজিত এলাকা সমূহের মুসলিমগণ তাঁদের ন্যায় 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন। পরবর্তীতে বহু রাজনৈতিক চাপ ও উত্থান-পতন সত্ত্বেও পঞ্চম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহর ও এলাকা সমূহে 'আহলুল হাদীছ' নামেই তাদের বসবাস যে উল্লেখযোগ্য হারে ছিল তা মাকদেসীর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও আবদুল কাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯/১০৩৭ খৃঃ)-এর বক্তব্যে বিবৃত হয়েছে।

ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও তাঁদের অনুসারী মুহাদ্দিছ উলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমেই পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার ন্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ইসলাম প্রচারিত হয়। তাঁদের হাতে ইসলাম ছিল তার নিজস্ব রূপে দীপ্যমান। সেই সময়ে আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে যে ইসলাম দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ও ব্যবসা কেন্দ্রে প্রচারিত হয়, তাও ছিল নির্ভেজাল এবং ছাহাবা ও তাবেঈ বিদ্বানদের আদর্শপ্লুত। কুরআন ব্যতীত তাঁদের সম্মুখে আর কোন গ্রন্থ ছিল না। রাসূল ও ছাহাবীদের আদর্শ ব্যতীত তাঁদের নিকটে আর কোন আদর্শ ছিল না। তাঁদের মাধ্যমে এদেশে কুরআন ও হাদীছের প্রচার ও প্রসার ঘঠেছে। তাঁদের হাতেই ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয়েছে। তাঁদের ব্যাপক দা'ওয়াত ও তাবলীগের ফলে মাত্র ৭০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম (৬৬-৯৬ হিঃ) যখন সিন্ধু আসেন, তখন মুসলিম জনগণের নিরাপত্তার জন্য কেবল মুলতানেই পঞ্চাশ হাযার সৈন্যের একটি বহর নিয়োগ করতে হয়। এতদ্ব্যতীত মানছূরা, আলোর প্রভৃতি শহরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী সামরিক কেন্দ্র ছিল। এইভাবে মানছূরা, মুলতান, সিন্দান, কুছদার (বেলুচিস্তান), কান্দাবীল প্রভৃতি স্থানগুলি কেবলমাত্র আরব বসতি কেন্দ্র ছিলনা বরং কুরআন ও হাদীছের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও মর্যাদাপূর্ণ ছিল।

প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে, ইল্মে হাদীছের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে যুক্ত। সেকারণে উপমহাদেশে হাদীছ চর্চার যুগগুলিকে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এখানে উপমহাদেশকেই আমরা প্রধান ভূমিকায় রাখব। কারণ মুসলিম রাজনৈতিক উত্থান-পতন এখানেই সবচেয়ে বেশী হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের প্রচারকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আহলেহাদীছ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যদিও মুসলিম-অমুসলিম কোন কোন পন্ডিতের দৃষ্টিতে তারা 'শাফেঈ' বলে অভিহিত হয়েছেন। মাকদেসী (মৃঃ ৪২৯/১০৩৭), মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) 'শাফেঈ' মাযহাবকে 'আহলেহাদীছ' হিসাবে গণ্য করেছেন। এটি প্রযোজ্য হ'তে পারে যদি হাদীছের উপরে 'রায়'-এর প্রাধান্য না থাকে।

তিনটি যুগ :

উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আমরা তিনটি প্রধান যুগে চিহ্নিত করতে পারি।

*১. **প্রাথমিক যুগঃ** ২৩-৩৭৫/৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ, (অন্যূন সাড়ে তিনশত বছর)।*

*২. **অবক্ষয় যুগঃ** ৩৭৫-১১১৪/৯৮৪-১৭০৩ খৃঃ, (অন্যূন ৭৩৯ বছর)।*

*৩. **আধুনিক যুগঃ** ১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) থেকে বর্তমান পর্যন্ত।*

৩৭৫ হিজরী থেকে অলিউল্লাহ যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসর সময়কালকে আমরা উপমহাদেশীয় বিচারে 'অবক্ষয় যুগ' বলেছি। কারণ 'গযনবী যুগে' (৩৮৮-৪৪৩/৯৯৭-১০৩০ খৃঃ) ক্ষমতাহারা শী'আদের গোপন দৌরাত্ম্য খুবই বেশী থাকায় সিন্ধুতে হাদীছ চর্চা ও আহলেহাদীছ আন্দোলন পুনরায় জোরদার হ'তে পারেনি। বাহমনী (৭৮০-৮৮৬/১৩৭৮-১৪৭২ খৃঃ) ও মুযাফ্ফরশাহী যুগে (৮৬৩-৯৮০/১৪৫৮-১৫৭২ খৃঃ) আহলেহাদীছ আন্দোলন কেবল দক্ষিণ ভারতেই জোরদার ছিল। কিন্তু রাজধানী দিল্লী হ'তে বাংলাদেশ পর্যন্ত উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় আহ্লুর রায়দের হুকুমত, সুবিধাভোগী আলেমদের চক্রান্ত ও ব্যাপক সামাজিক অনুদারতার ফলে আহলেহাদীছ আন্দেলন একেবারে নিবু নিবু পর্যায়ে চলে এসেছিল। অতঃপর আওরঙ্গযেব (১০৬৮-১১১৮/১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ)-এর পরবর্তী ভোগলিপ্সু শাসকদের আমলে দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার মাধ্যমে অলিউল্লাহ পরিবারের উত্থান আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করে। শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১খৃঃ)-এর জিহাদ আন্দোলনের সময়ে যা দ্রুতগতিতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসা রহীমিয়ারই পরবর্তী বিহারী শিক্ষক শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) বিপুল ছাত্রবাহিনীর মাধ্যমেই প্রধানতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করে এবং দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও বিস্তার লাভ করে।

প্রাথমিক যুগ (২৩-৩৭৫ হিঃ/ ৬৪৪-৯৮৪ খৃঃ)

এই যুগের মহান নেতৃবৃন্দ ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও মুহাদ্দিছবৃন্দ। এই সময়ে হিন্দুস্থানে ১৮ জন মতান্তরে ২৫ জন ছাহাবীসহ উমাইয়া খেলাফতের শেষ (১৩২/৭৫০ খৃঃ) পর্যন্ত সর্বমোট ২৪৫ জন তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈর শুভাগমন ঘটে। তন্মধ্যে সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন সিনান বিন সালামাহ বিন মুহবিক আল-হুযালী। ইনি মক্কা বিজয়ের দিন জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) নিজে তার নাম রাখেন। আমীর মু'আবিয়ার শাসনকালে (৪১-৬০ হিঃ) ৪২ ও ৪৮ হিজরীতে দু'দুবার তাঁকে হিন্দুস্থান বা সিন্ধু এলাকার গভর্ণর হিসাবে প্রেরণ করা হয়। তাঁর মৃত্যু ও মৃত্যুসন সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মতভেদ করেছেন। তবে বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তির আলোকে ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন যে, তিনি ৫৩ হিজরী মোতাবেক ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্তানের 'খাযদার' (خضدار) নামক স্থানে শাহাদত বরণ করেন।

ছাহাবা ও তাবেঈদের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইলমে হাদীছের বীজ বপিত হ'লেও হাদীছের প্রচার ও প্রসারে তাঁরা বিশেষ মনোযোগী হ'তে পারেননি। কারণ রাসূলের (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত ছাহাবা ও তাবেঈগণকেই সাধারণতঃ বিভিন্ন অভিযানে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হ'ত। ফলে যুদ্ধের পরিবেশে ইলমে হাদীছের প্রচার আশানুরূপ হয়নি। ২য়তঃ যুদ্ধাভিযান শেষে উপমহাদেশে তাঁদের অবস্থানকাল থাকত খুবই সংক্ষিপ্ত। ৩য়তঃ ইলমে হাদীছের প্রচারের জন্য যে রাজনৈতিক ও সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন ছিল, তা অনেক ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। তবুও ইসলামের সাবলীলতা এবং ছাহাবা ও তাবেঈ বিজ্ঞ জনের অনুপম চরিত্র মাধুর্যে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এদেশের অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা ছাহাবা ও তাবেঈ বিদ্বানদের প্রভাবে শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া মুহাম্মাদ বিন কাসিম (৬৬-৯৬ হিঃ) দেবল, মুলতান ও তৎসন্নিহিত এলাকাসমূহে মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কয়েকটি শহর গড়ে তোলেন। গড়ে ওঠে বায়যা, মাহ্ফূযা, মানছূরা প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরীসমূহ। এসব এলাকায় মসজিদ সমূহ নির্মাণ করা হয়। নিয়োগ করা হয় পৃথকভাবে আমীর, খতীব ও কাযীবৃন্দ। মুসলমানগণ এইসব শহরে অত্যন্ত শান্তিতে ও নির্বিবাদে জীবন যাপন করতেন। আরব সেনাবাহিনীতে বিশেষভাবে এমন কিছু বিদ্বানকে পাঠানো হয়েছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৬ হিঃ) যাদেরকে হিন্দুস্থান এলাকায় কুরআন-হাদীছ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা অনেকেই এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং কুরআন ওহাদীছের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। ফলে দেবাল, মুলতান, কুছদার (বেলুচিস্তান), লাহোর, মানছূরা (করাচী) প্রভৃতি শহরগুলি ইলমে হাদীছের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের জন্য আলিম ও মুহাদ্দিছ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সেটি হ'ল, এইযুগে হিন্দুস্থান এলাকায় নিয়োজিত অধিকাংশ ওয়ালী ও কাযীগণ ছিলেন সততা, দ্বীনদারী এবং কুরআন ও হাদীছের ইলমে সমৃদ্ধ উজ্জ্বল তারকাসদৃশ। তাঁদের প্রভাব ছিল প্রজাদের উপরে অসাধারণ। তাঁরা ছিলেন যুগের নমুনা ও সকলের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যেমন উছমান গণী (রাঃ)-এর সময়ে (২৩-৩৫ হিঃ) সিন্ধু এলাকায় কাযী হুকাইম বিন জাবালাহ আবাদী, আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের যুগে (৬৫-৮৬) সাঈদ বিন আসলাম কিলাবী, মুজা'আ বিন সি'র, মুহাম্মাদ বিন হারূন বিন যিরা' আল-নুমাইরী প্রমুখ কাযীবৃন্দ যেমন একদিকে ছিলেন অনন্যসাধারণ বিচারকমণ্ডলী, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন কুরআন ও হাদীছে পারদর্শী অতুলনীয় পণ্ডিত। কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ন্যায়বিচারের ফলে মানুষ কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়, আহলেহাদীছ আন্দোলনের যা প্রধান দাবী। প্রাদেশিক আমীরদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম (৬৬-৯৬) ছিলেন অনন্য গুণসম্পন্ন নেতা। তাঁর সময় থেকেই সিন্ধু ইসলামী খেলাফতের স্থায়ী প্রদেশের মর্যাদা পায়। খ্যাতনাম ছাহাবী আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর সম্ভাব্য শিষ্য তাবেঈ বিদ্বান তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম ২৭ বৎসর বয়সে ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু আগমন করেন এবং ৯৬ হিজরীতে উচ্চমহলের রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হ'য়ে নিহত হন। মাত্র তিন বছরের স্বল্পকালীন সময়ে সমগ্র বিজিত এলাকায় তিনি ইসলামী শাসনের এমন সুবাতাস বইয়ে দেন যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মুগ্ধ প্রজাসাধারণ তাঁর বিয়োগ ব্যথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল এবং অমুসলিমগণ ভক্তি শ্রদ্ধায় তাঁর মূর্তি গড়েছিল। তাঁর সময়ে চতুর্দিকে

ইল্‌মে হাদীছের চর্চা হ'তে থাকে। আরব জগত হ'তে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী উলামা ও মুহাদ্দেছীন সিন্ধুতে আগমণ করতে থাকেন। সিন্ধুর বহু ছাত্র আরব দেশে গিয়ে ইলমে হাদীছের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। ফলে এই যুগে বহু হিন্দী উলামা মুহাদ্দিছ-এর জন্ম হয়। এই যুগের (২৩-৩৭৫) উলামা ও মুহাদ্দেছীনকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১ম-ঐ সকল ভারতীয় বংশোদ্ভূত উলামা, যাঁরা আরব ভূমিতে জীবন কাটিয়েছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন। যেমন খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম মাক্‌হূল বিন আব্দুল্লাহ সিন্ধী (মৃঃ ১১৩ হিঃ) মূলতঃ কাবুলের মানুষ। কিন্তু সিরিয়াতে জীবন কাটান ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। অনুরূপভাবে তাবেঈ ইমাম আবদুর রহমান সিন্ধী, মূসা সিলানী (সিংহলী), আব্দুর রহমান বিন আবী যায়েদ বেলমানী (সিন্ধু ও গুজরাটের মধ্যবর্তী স্থান), হারেছ বেলমানী, তাবে-তাবেঈ মুহাম্মাদ বিনুল হারেছ বেলমানী, মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বেলমানী, আবদুর রহমান বিন আমর সিন্ধী ওরফে ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হিঃ), আবু মা'শার নাজীহ বিন আবদুর রহমান সিন্ধী, ক্বায়েস বিন বুস্‌র বিন সিন্ধী, ইয়াযীদ বিন আব্দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ'। ২য়ঃ ঐসকল মুহাদ্দিছ যাঁরা এদেশেই জীবন কাটিয়েছেন এবং ইল্‌মে হাদীছের প্রসার ঘটিয়েছেন।

নিম্নে আমরা এই যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদের নাম উল্লেখ করব, যাঁরা দক্ষিণ এশিয়ায় ও ভারত বর্ষে ইল্‌মে হাদীছের প্রচারে ও আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রসারে সর্বাধিক অবদান রেখেছেন।

১ম যুগের (২৩-৩৭৫) কয়েকজন সেরা মুহাদ্দিছঃ

১-মূসা বিন ইয়াকূব ছাক্বাফী :

আরবের ছাক্বাফী গোত্রের মশহুর মুহাদ্দিছ মূসা বিন ইয়াকূব ছাক্বাফীকে মুহাম্মাদ বিন কাসিম (৬৬-৯৬ হিঃ) আলোরের কাযী নিযুক্ত করেন। একই সাথে তাঁকে জুম'আর খুৎবা প্রদান ও ধর্মীয় বিষয়ক কার্যাবলীর দায়িত্বভার এবং বিশেষভাবে জনগণের নৈতিক সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি একনিষ্ঠভাবে সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন। তাঁর পরিবারে কুরআন ও হাদীছের চর্চা খুব বেশী ছিল। তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই বংশানুক্রমে আলোরের কাযীর পদ অলংকৃত ছিল। তিনি স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাস করেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁর পরিবার ইল্‌মে হাদীছে এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, ৬১৩ হিঃ/১২১৬ খৃষ্টাব্দেও এই পরিবারের অন্যতম বিখ্যাত পন্ডিত ইসমাঈল বিন আলী ছাক্বাফী সিন্ধী সমসাময়িক যুগে ইল্‌ম ও তাক্বওয়া এবং ভাষা ও সাহিত্যে অদ্বিতীয় হিসাবে গণ্য হতেন। তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে তাঁর ঊর্ধতন কোন একজন পিতামহ 'মিনহাজুদ্দীন' নামে সিন্ধুতে মুসলিম বিজয়ের যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তার কিয়দংশ পরবর্তীকালে পাওয়া যায়। আলী বিন হামিদ কূফী তা সংকলন করেন। অতঃপর সেখানে থেকে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় পর্যন্ত ইতিহাস ফারসী ভাষায় 'ফতহনামা' বা 'চাচনামা' নামে ৬১৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

২-ইসরাঈল বিন মূসা বাছরী (মৃঃ ১৫৫/৭৭১ খৃঃ) :

ইনি মূলতঃ বছরার অধিবাসী হ'লেও সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এজন্য তাঁকে 'নাযীলুল হিন্দ' বলা হয়। তিনি তাবে-তাবেঈ ছিলেন। তিনি হাদীছের একজন বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন। ছহীহ বুখারীতে চার জায়গায় তাঁর বর্ণিত হাদীছ স্থান পেয়েছে। তিনি হাসান বাছরী (২১-১১০ হিঃ), আবু হাযেম আশজা'ঈ (মৃঃ ১১৫ হিঃ), মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ), ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (৩৪-১১৪) হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১), সুফিয়ান বিন উয়ায়না (১০৭-১৯৮), হুসাইন বিন আলী জু'ফী (মৃঃ ২০৫), ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান (১২০-১৯৮) প্রমুখ হাদীছশাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ দিকপালগণ। এইসব মহা মনীষীদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হওয়াটাই হাদীছ বিশারদ হিসাবে তাঁর জন্য সর্বাপেক্ষা বড় গর্বের বিষয়। সুনানের কিতাব সমূহেও তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহ রয়েছে।

৩-আমর বিন মুসলিম বাহেলী (মৃঃ ১২৩/৭৪০ খৃঃ) :

ট্রান্স অক্রিয়ানার দিগ্বিজয়ী সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিমের ভাই আমর বিন মুসলিম খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১/৭১৭-৭১৯ খৃঃ)-এর গবর্ণর হিসাবে সিন্ধুতে আগমন করেন। তাঁরই গবর্ণর থাকাকালীন সময়ে খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দাহিরপুত্র জীসাহ সহ হিন্দুস্থানের কয়েকজন রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সময় খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছ সংকলনের নির্দেশ জারী করেন। তিনি তাঁর ফরমানে স্পষ্ট করে বলে দেন যে, আহলুস্‌সুন্নাহ বা হাদীছপন্থীদের কাছ থেকেই কেবল হাদীছ গ্রহণ করতে হবে, বিদ'আত পন্থীদের কাছ থেকে নয়।' খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয়ের সিন্ধুর প্রদেশিক আমীর আমর বিন মুসলিম আল-বাহেলী (মৃঃ ১২৩/৭৪০ খৃঃ) হাদীছপন্থী ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। সিন্ধু এলাকায় ইল্‌মে হাদীছের প্রচার ও প্রসারে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি ইয়ালা বিন ওবায়েদ হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে আবু তাহের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছ নাসাঈ ও আবুদাঊদে স্থান পেয়েছে।

৪-রবী' বিন ছুবাইহ সা'দী আল-বাছরী (মৃঃ ১৬০/৭৭৬ খৃঃ)

আব্বাসীয় খলীফা মাহ্‌দী-এর সময়ে (১৫৮-১৬৯/৭৭৪-৭৮৫ খৃঃ) সেনাপতি আবদুল মালিক বিন শিহাব মাসমাঈর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে নৌ-অভিযান প্রেরিত হয়, রবী' সেই সঙ্গে ভারতে আসেন। উক্ত বাহিনী দক্ষিণ ভারতের ভ্রূচ বন্দরের নিকটবর্তী 'ভারভাট' নামক সমৃদ্ধিশালী বন্দরনগরী জয় করে। কিন্তু এই সময় উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক মহামারী ছড়িয়ে পড়লে দেশে ফেরার পথে আক্রান্ত হয়ে রবী' বিন ছুবাইহ পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন। ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে তাঁকে দাফন করা হয়। রবী' বিন ছুবাইহ হাসান বাছরীর (২১-১১০ হিঃ) শিষ্য ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনা ছাড়াও তিনি হামীদ আত্-ত্বাবীল (মৃঃ ১৪২ হিঃ), ছাবিত আল-বুনানী (৪১-১২৭), মুজাহিদ বিন জাব্‌র (২১-১০৩) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছজ্ঞ বিদ্বানগণের নিকট থেকেও হাদীছ শ্রবণ করেন। সমসাময়িক কালের রাবীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা এত উচ্চে ছিল যে, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (১১৮-১৮১), সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১), ওয়াকী (১২৯-১৯৮) ইমাম আবুদাঊদ তায়ালিসী (মৃঃ ২০৩), আব্দুর রহমান বিন মাহদী (১৩৫-১৯৮) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত হাদীছবিশারদ পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি হাদীছশাস্ত্রের সেই ঝাণ্ডাবাহীদের অন্যতম ছিলেন, যারা দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেউ কেউ তাঁকে 'তাবেঈ' হিসাবে গণ্য করেছেন।

['আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে গৃহীত]।

কা'বা মুশাররাফাহ ও মাসজিদুল হারাম

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

{আজ থেকে বহু বহু বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম মনুষ্য জনপদ গড়ে তুলেছিলেন। সেই থেকে মক্কা হয়ে উঠে বিশ্বের ঈমানদার মানুষদের জন্য এক দুর্নিবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। হাযার হাযার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহ্‌র আবেগ-অনুভূতির সাথে একাকার হয়ে সগৌরবে দণ্ডায়মান রয়েছে বায়তুল্লাহ কা'বা মুশাররাফাহ। উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল ৯ম হিজরীতে। এতদিনে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ১৪২৪টি বছর। কিন্তু মক্কার প্রতি মুসলিম উম্মাহর সেই আবেগের জোয়ারে কখনই ভাটার টান পড়েনি। বরং তার প্রবল ঘূর্ণিস্রোতে প্লাবিত হয়ে পুণ্যভূমি মক্কা আজও মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে সততঃ বিকাশমান। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ হাজীর পদভারে প্রকম্পিত হয় বায়তুল্লাহ শরীফ। যে আকর্ষণকে কেন্দ্র করে এই মক্কা মুকাররামাহ এবং আজকের সঊদী আরবের বিখ্যাত হয়ে উঠা-সেই কা'বা ও মসজিদুল হারামের ইতিহাস নিয়েই এবারের বিশেষ নিবন্ধটি- নির্বাহী সম্পাদক।}

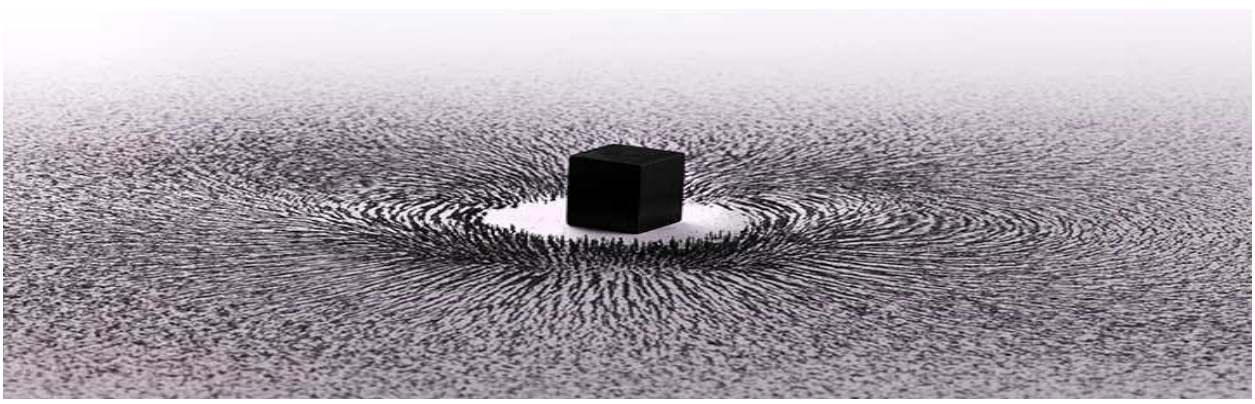

বিশ্ব মুসলিমের কেবলা ও পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গৃহ বায়তুল্লাহ বা কা'বা শরীফের আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীতে মানবজাতির আগমনের পূর্বেই। আল্লাহ্‌র নির্দেশে যমীনের বুকে এই গৃহ নির্মাণ করেছিলেন ফেরেশতাগণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এই গৃহ, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারাবিশ্বের মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ ও বরকতময়' *(আলে ইমরান ৯৬)*। নূহ (আঃ)-এর সময় সংঘটিত সেই ভয়ংকর প্লাবনের মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নির্দেশে কাবাকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে সাথে নিয়ে এ গৃহটি পুনঃনির্মাণ করেন। এর পর থেকে নিয়মিতভাবেই মানুষ এখানে হজ্জের জন্য আগমন করতে শুরু করল *(হজ্জ ২৬-২৭)*। ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক এই পুনঃনির্মাণ কাজের পর বিগত ৫০০০ বছরে বেশ কয়েকবার এ ঘরটি পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সে ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হল–

বায়তুল্লাহ্‌র পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম :

হাদীছের ভাষ্য ও ঐতিহাসিক তথ্য মোতাবেক কা'বাগৃহ প্রথম নির্মাণের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১২ বার পুননির্মিত হয়েছে। নির্মাণকারীগণ হলেন– ১. ফেরেশতা। ২. আদম (আঃ)। ৩. শীছ (আঃ)। ৪. ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)। ৫. আমালেকা জাতি। ৬. জুরহাম জাতি। ৭. কুসাই বিন কিলাব। ৮. কুরাইশ গোত্র। ৯. আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) (৬৫ হিঃ)। ১০. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৪ হিঃ)। ১১. সুলতান মুরাদ তুর্কী (১০৪০ হিঃ)। ১২. বাদশাহ ফাহদ বিন আব্দুল আযীয (১৪১৭ হিঃ)। নিম্নে এ সকল সংস্কার কার্যক্রমের চৌম্বক অংশগুলো উল্লেখ করা হল।

কুরাইশদের পুনঃনির্মাণ :

আবরাহার হস্তীবাহিনীর কাবা আক্রমণের প্রায় ৩০ বছর পর এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নবুওত প্রাপ্তির ৫ বছর পূর্বে (হিজরতের ১৮ বছর পূর্বে) মক্কায় এক ভয়াবহ বন্যার দরুন কাবাঘর বিধ্বস্ত হয়। ফলে এটি পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন পড়ে। কুরাইশ গোত্রের নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা এ ঘর নির্মাণে কোন হারাম বা অবৈধ অর্থ ব্যয় করবেন না। ফলে নির্মাণের সময় অর্থের ঘাটতি পড়ে যায়। বাধ্য হয়েই তারা ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত বায়তুল্লাহ্‌র ভিত থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ৩ মিটার পরিমাণ হ্রাস করে নতুন ভিত নির্মাণ করে। এর পূর্বে কাবাঘরে কোন ছাদ ছিল না। কুরাইশরা কাবার উপর ছাদ দিয়ে দেয়। কাবার দরজা মাতাফ থেকে বেশ উপরে স্থাপন করা হয় যাতে ইচ্ছামত কেউ সেখানে প্রবেশ না করতে পারে। উল্লেখ্য যে, এই পুনর্নির্মাণকাজে মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন এবং সম্ভাব্য কলহ-বিবাদ মিটিয়ে নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করেন। তাঁর বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে কুরাইশ জাতি এক ভয়াবহ সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের সংস্কার :

ছহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে আয়েশা! যদি তোমার কওম নবমুসলিম না হত, তাহলে আমি কাবাঘর ভাঙ্গার নির্দেশ দিতাম, অতঃপর যেটুকু অংশ কুরাইশরা বাদ দিয়েছে তা আবার কাবার অন্তর্ভুক্ত করে কাবার দরজাকে আনুভূমিক মিলিয়ে দিতাম। আর পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি দরজা বানিয়ে দিতাম, যাতে তা পুরোপুরি ইবরাহীমী ভিত্তির উপর ফিরে আসে *(বুখারী হা/১৫৮৬)*। এই হাদীছের পরিপ্রেক্ষিতে ৬৫ হিজরীতে মক্কার তৎকালীন গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) কাবাঘরকে

ভেঙ্গে ইবরাহীমী ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করেন এবং ঘরের দু'পার্শ্বে দুটি দরজা স্থাপন করে দেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সংস্কার :

৭৩ হিজরীতে উমাইয়া শাসক আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান মক্কার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী মক্কা দখলের জন্য প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে মাসব্যাপী যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কাবাঘর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধের পর খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের (রাঃ) ভিত্তি ভেঙ্গে পুনরায় কুরাইশী ভিত্তির উপর কাবাঘর নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি জানতে পেরে আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান অনুতপ্ত হন এবং পুনরায় আগের ভিত্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ইমাম মালেক (রঃ)-এর কাছে মতামত জানতে চান *(মুসলিম হা/৩৩০৯-১০)*। ইমাম মালেক (রঃ) তাকে আল্লাহ্‌র ঘর নিয়ে যথেচ্ছা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, শাসকদের মর্জিমাফিক কাবার এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন অব্যাহত থাকলে মানুষের অন্তরে কাবার মর্যাদা হ্রাস পাবে। ইমাম মালেকের এই উপদেশের কারণে কাবাঘরকে মূল ভিত্তি পর্যন্ত বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা পরবর্তীতেও আর নেয়া হয়নি। এর পরিবর্তে মূল অংশ পর্যন্ত একটি ছোট প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে যাকে 'হাতীম' বলা হয়।

সুলতান মুরাদের সংস্কার :

এটাই কাবার সর্বশেষ বা বর্তমান ভিত্তি। ১০৪০ হিজরীতে (১৬৩০খৃঃ) মক্কায় বৃষ্টির কারণে এক বিরাট বন্যার সৃষ্টি হয় এবং কাবাঘর প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পরে তুর্কী সুলতান মুরাদ (৪র্থ)-এর নির্দেশে কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করা হয়। অদ্যাবধি এ ভিত্তিটিই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

সঊদী শাসনামলে গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম :

তুর্কী সুলতান মুরাদের নির্মাণকার্যের পর ৩৭৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। ইমারতের অবস্থা এমনই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তা নতুনভাবে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। এজন্য খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কাবাঘর পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ১৯৯৬ সালে বিন লাদেন গ্রুপের তত্ত্বাবধানে ছয় মাস ধরে এই সংস্কারকর্ম সম্পন্ন হয়।

কাবাগৃহ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলী :

কাবাগৃহের পরিচিতি :

কাবা (الكعبة) শব্দের শাব্দিক অর্থ হল চারকোনা। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হওয়ায় এ ঘরের নামকরণ করা হয়েছে কাবা। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদায় দুইবার এই গৃহকে কাবা বলা হয়েছে। এছাড়া 'বায়ত', 'বায়তুল আতীক', 'মাসজিদুল হারাম', 'বায়তুল মুহাররাম' প্রভৃতি নামেও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্গাকার এই ঘরটির দৈর্ঘ্য ৪২.২ ফুট (১২.৮৬ মিটার), প্রস্থ ৩৬.২ ফুট (১১.০৩ মিটার) এবং উচ্চতা ৪৩ ফুট (১৩.১ মিটার)। ভূমি থেকে ১৪ ইঞ্চি পুরু মার্বেল পাথরের বেজমেন্টের উপর ঘরটি দাঁড়িয়ে আছে। মক্কার বিভিন্ন পাহাড় থেকে সংগৃহীত গ্রানাইট পাথর দিয়ে ঘরের দেয়াল নির্মিত। শূন্য ঘরের অভ্যন্তরভাগে মার্বেল পাথরের তৈরী তিনটি খুঁটি রয়েছে, যা নকশী কাঠ দিয়ে মোড়া। মেঝেতে শ্বেত পাথর ও দেয়ালে মর্মর পাথর দিয়ে আকর্ষণীয় কারুকার্য করা হয়েছে। ঘরের উর্ধ্বাংশ ও ছাদ জুড়ে রূপার অক্ষরে কুরআনের আয়াত খচিত সবুজ রেশমী পর্দা ঝুলানো আছে। ছাদের উপর কাঁচ দিয়ে ঢাকা ছোট একটি ছিদ্র রয়েছে, যা দিয়ে ভিতরে স্বাভাবিক আলো আসে। এছাড়া এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটি সিঁড়ি রয়েছে, যার মাধ্যমে এই ছিদ্র দিয়ে ছাদে উঠতে হয়।

কাবার পূর্বকোণকে বলা হয় রুকনে শারক্বী বা রুকনে আসওয়াদ যা কাবার দরজার ঠিক ডান পার্শ্বে এবং যমযম কুপের প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। হাজীরা এখান থেকেই তাওয়াফ শুরু করেন। উত্তরকোণকে বলা হয় রুকনে শিমালী বা রুকনে ইরাক্বী (ইরাকমুখী হওয়ার কারণে)। পশ্চিমকোণকে বলা হয় রুকনে গারবী বা রুকনে শামী (সিরিয়ামুখী হওয়ার কারণে)। আর দক্ষিণকোণকে বলা হয় রুকনে জুনুবী বা রুকনে ইয়ামানী (ইয়ামানমুখী হওয়ার কারণে)। কাবাকে প্রতিবছর রামাযান ও হজ্জের মাসখানিক পূর্বে মোট দুইবার ধৌত করা হয়। এ সময় সঊদী বাদশাহসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা উপস্থিতি থাকেন। কাবার দরজার চাবী রাসূল (ছাঃ)-এর ওছিয়ত অনুযায়ী আজও পর্যন্ত বনু শায়বা বংশের উত্তরাধিকারীদের কাছে সংরক্ষিত থাকে।

হাজরে আসওয়াদ :

কাবার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে যে কালো পাথর বা হাজরে আসওয়াদটি রয়েছে, তা মূলতঃ একটি জান্নাতী পাথর। যা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়ে কা'বাঘরের কোণে লাগিয়ে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে আগত, এটা বরফের চেয়ে বেশী সাদা ছিল, আদম সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দিয়েছে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১৮)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকুতসমূহের

দুটি ইয়াকুত, যার নূরকে আল্লাহ ঢেকে রেখেছেন। যদি তা ঢেকে না রাখতেন তবে তা পূর্ব-পশ্চিমব্যাপী সর্বত্র আলোময় করে ফেলত *(ছহীহ তিরমিযী, মিশকাত হা/২৫৭৯)*। প্রথমে তা আস্ত একটা টুকরো ছিল। কিন্তু ৯৫০ খৃষ্টাব্দে কারামতিয়া শী'আরা পাথরটিকে তুলে নিয়ে যায়। ২০ বছর পর ৯৭০ সালে তা পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু পরে কোন এক সময়ে পাথরটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বর্তমানে এর আটটি ছোট ছোট টুকরো অবশিষ্ট রয়েছে। সবচেয়ে বড় টুকরোটি খেজুরের বীচির সমান। এই টুকরোগুলোকে প্রায় ১ ফুট ব্যাসার্ধের পাথরের মধ্যে লাগিয়ে রাখা আছে ও তার চারিপাশ দিয়ে রৌপ্যের ফ্রেম লাগানো হয়েছে। এই রৌপ্যের ফ্রেম লাগানোর কাজটি প্রথম সূচনা করেন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)।

কাবার দরজা :

উত্তর-পূর্ব দেয়ালে ভূমি থেকে প্রায় ৭ ফুট (২.১৩ মিঃ) উচ্চতায় অবস্থিত কাবার একমাত্র দরজাটির দৈর্ঘ্য ৩.১০ মিটার এবং প্রস্থ ১.৯০

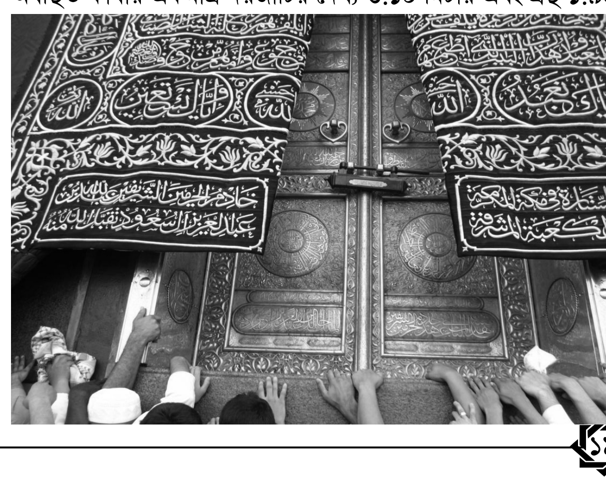

মিটার। লৌহনির্মিত এই দরজায় সর্বপ্রথম স্বর্ণের প্রলেপ লাগান রাসূল (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব। ১৯৭৯ সালে বাদশাহ খালেদ বিন আব্দুল আযীয এ দরজা দুটিতে খাটি স্বর্ণের পাত লাগাতে নির্দেশ দেন। যাতে মোট ১ কোটি ৩৪ লাখ ২০ হাজার রিয়াল ব্যয় হয়। মোট ২৮০ কেজি স্বর্ণ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল পাল্লার উপর এই অনুপম কারুকার্য সম্পন্ন করতে দীর্ঘ এক বছর লাগে। দরজার উপর পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত এবং আল্লাহ্‌র ১৫টি গুণবাচক নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। দরজায় লাগানো তালাটি ১৯৬৯ সালে বানানো হয়েছে, যা দেখতে তুর্কী সুলতান আব্দুল হামীদের তৈরী পুরাতন তালার মতই।

কাবার গিলাফ :

কাবার উপর গিলাফ চড়ানোর প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কারো মতে, ইসমাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম গিলাফ পরিধান করান। আর

উনবিংশ শতাব্দীতে কাবা গৃহ

কারো মতে, ইয়ামানের বাদশা আস'আদ হিময়ারী তুব্বা কর্তৃক গিলাফ লাগানোর সূচনা হয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামসহ পরবর্তী কোন যুগেই এ প্রথার ব্যত্যয় ঘটেনি। ১৯৭২ সালে বাদশাহ ফাহদ কাবার গিলাফ তৈরীর জন্য একটি পৃথক কারখানা নির্মাণের নির্দেশ দেন। ১৯৭৭ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। ২৪০ জন কর্মচারীবিশিষ্ট এই কারখানা থেকেই প্রতিবছর কাবার গিলাফ সরবরাহ করা হয়। গাড়ো কালো রঙের এই গিলাফটি ৫টি খণ্ডবিশিষ্ট, যা অতি উন্নতমানের রেশম ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরী। গিলাফের মাঝ বরাবর পট্টিতে কারুকার্যখচিতভাবে কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করা থাকে। আর দরজা বরাবর পর্দা আকারে অত্যন্ত সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফীতে আঁটা ঝালর যুক্ত থাকে। প্রতিবছর ৯ই জিলহজ্জ তথা হজ্জের দিন এই গিলাফটি পরিবর্তন করা হয়।

মুলতাযাম :

হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে কাবাঘরের দরজা পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থলটুকুকে মুলতাযাম বলে। এ স্থানের দৈর্ঘ্য ৪ হাতের (২ মিটার) মত। এ স্থানে রাসূল (ছাঃ) কাবার দেয়ালের সাথে চেহারা, বুক ও হাত মিশিয়ে দিতেন বলে এ স্থানের নাম 'মুলতাযাম' বা 'মিলিত হওয়ার স্থান'।

হাতীম :

কাবার উত্তর-পশ্চিমাংশে দেড় মিটার উচ্চতার অর্ধবৃত্তাকার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা যে অংশটি রয়েছে তাকে হাতীম বলা হয়। আর প্রাচীরটিকে বলা হয় 'হিজরে ইসমাঈল'। কাবাঘরের প্রাচীর থেকে এই প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশের দৈর্ঘ্য সাড়ে ৮ মিটারের মত। এ অংশটি মূল কাবারই অংশবিশেষ, যা কুরাইশরা অর্থাভাবে কাবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। একে হাত্বীম তথা 'ধ্বংসকৃত' বলা হয় এ জন্য যে, এ স্থলে তওবা করলে মানুষের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয় অথবা যেহেতু স্থানটি কাবার ভগ্নাংশ। উল্লেখ্য যে, প্রাচীর ঘেরা অংশটি পুরোটাই কাবাগৃহের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী এখানে কাবার অংশ হল ৬ হাত বা ৩ মিটার পর্যন্ত *(মুসলিম হা/৩৩০৮)*। তবে তাওয়াফ করতে হয় প্রাচীরের বাইরে থেকেই।

মীযাব :

মীযাব হল কাবাগৃহের ছাদ থেকে পানি পড়ার নালা। কাবাগৃহের উপর পূর্বে কোন ছাদ ছিল না। সর্বপ্রথম কুরাইশরা ছাদ নির্মাণ করে এবং ছাদের পানি নীচে গড়িয়ে দেয়ার জন্য 'মীযাব' বা পানি পড়ার নালা তৈরী করে। বর্তমানে এই নালাটিকে স্বর্ণের প্রলেপ দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে।

মাতাফ :

কাবাগৃহের চতুর্পার্শ্বের খোলা আঙ্গিনাকে মাতাফ বলা হয়। এ স্থানে তাওয়াফ করা হয় বলে এর নাম 'মাতাফ' রাখা হয়েছে। এ স্থানটি সর্বপ্রথম পাকা করেন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)। তখন কেবল মাক্বামে ইবরাহীমকে সামনে করে ছালাত আদায় করা হত। পরবর্তীতে মুছল্লীসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ২য় শতাব্দী হিজরীর শুরুতে গভর্নর খালেদ আল-ক্বাছরী ক্বাবার চতুর্পার্শ্বে কাতার বানিয়ে দেন। ১৯৫৬ সালে মাতাফকে প্রায় ৫০ মিটার প্রশস্ত গোলাকার প্রাঙ্গণে পরিণত করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূকের নির্দেশে ৮০১ হিজরীতে (১৪০৬ খৃঃ) মাতাফের উপর কাবাগৃহের চারপাশে চারটি মুছাল্লা নির্মাণ করা হয়। এখানে চার মাযহাবের

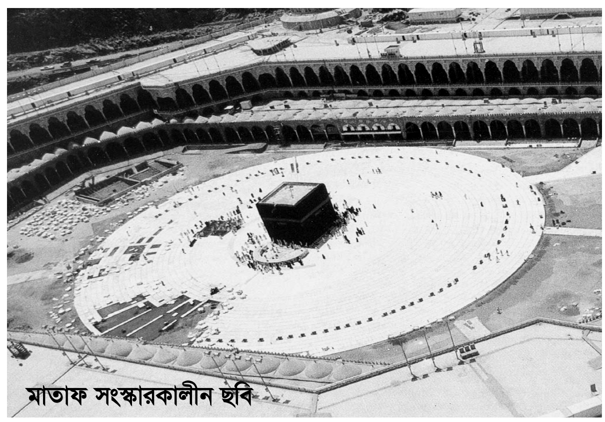
মাতাফ সংস্কারকালীন ছবি

অনুসারীরা পৃথক পৃথক মুছাল্লায় স্ব স্ব মাযহাবের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর ১৩৪৩ হিজরীতে (১৯২৫ খৃঃ) সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয আলে সঊদ এই চার মুছাল্লা উচ্ছেদ করেন এবং একই ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

মাক্বামে ইবরাহীম :

যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন তাকে 'মাক্বামে ইবরাহীম' বলা হয়। কয়েক সহস্র বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এই পাথরে ইবরাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন অদ্যাবধি সুস্পষ্টভাবে অংকিত রয়েছে। প্রথমে পাথরটি উন্মুক্ত অবস্থায় কাবাঘরের খুব কাছেই রাখা হত। উমর (রাঃ) সর্বপ্রথম

তাওয়াফের সুবিধার জন্য একে কিছুটা দূরে সরিয়ে দেন। পরবর্তীতে একটি সিন্দুকে এটি সংরক্ষণ করা হত। ১৯৬৭ সালে সঊদী সরকার মাক্বামে ইবরাহীমকে একটি মূল্যবান ক্রিস্টাল পাথরের উপর স্থাপন করে ৩ মিটার উঁচু লোহার শক্ত জালি দিয়ে মনুমেন্টটি ঘিরে দেয়। ১৯৯৭ সালে ২০ লক্ষ রিয়াল ব্যয়ে 'মাক্বামে ইবরাহীম' পুনসংস্কার করা হয়। এ সময় কালো পাথরে রক্ষিত 'মাক্বামে ইবরাহীম' সাদা মর্মর পাথরের উপর স্থাপন করা হয় এবং দেখার সুবিধার্থে বহিরাবরণ হিসাবে স্বচ্ছ গ্লাস লাগানো হয়। একইসাথে চতুর্দিকে ঘেরা লোহার জালিতে স্বর্ণের পালিশ করে 'মাক্বামে ইবরাহীম'কে একটি সুদৃশ্য অবয়ব প্রদান করা হয়।

যমযম কূপ :

যমযম পানি আল্লাহ্‌র এক অলৌকিক নিদর্শন। মরুর বুকে প্রায় ৫ হাজার বছর ধরে অবিরাম প্রবাহিত হয়ে চলেছে এই অলৌকিক পানির ফোয়ারা। বলা যায় এটি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন জীবন্ত কূপ। ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, পানির খোঁজে মক্কার সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হাজেরা উর্ধ্বশ্বাস বিচরণ করছিলেন। এ সময় আল্লাহ্‌র নির্দেশে জিবরাইল (আঃ) স্বীয় পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে এই কূপের সূচনা করেন *(বুখারী হা/৩৩৬৫)*। যমযম (زمزم) শব্দটি আরবী زمام শব্দমূল থেকে নির্গত, যার অর্থ নিয়ন্ত্রণ করা বা লাগাম ধরা। তাই আজ্ঞাবাচক দ্বিরুক্ত ক্রিয়াটির অর্থ হয়- থাম, থাম। কথিত আছে, পানির অতিরিক্ত প্রবাহ দেখে হাযেরা (আঃ) হতকচিত হয়ে এই শব্দটি উচ্চারণ করেন। এজন্য কূপটির নামকরণ এরূপ হয়েছে। যমযম পানির বৈশিষ্ট্য হল এর কোন রং বা গন্ধ নেই। তবে বিশেষ এক ধরনের স্বাদ রয়েছে, যা অন্য পানি থেকে একেবারেই ভিন্ন। কূপটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে পানির গভীরতা এক মানুষের সমানও না। অথচ প্রতি মুহূর্তে তলদেশস্থ বালুর নিচ থেকে অবিরত ধারায় পানি উঠছে। এই বিপুল পানির উৎস নিয়ে বিজ্ঞানীরা কোন কুল-কিনারা পাননি। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, পার্শ্ববর্তী ইবরাহীমী উপত্যকায় জমা বৃষ্টির পানি এবং পাহাড়ী ঢলই এর উৎস। তবে এ ধারণার যথার্থতা নেই। কেননা যে পরিমাণ পানি যমযম থেকে নিয়মিত উত্তোলন করা হয়, তা কেবল মরুভূমির অনিয়মিত বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল-এটা ভাবা নিছক কষ্টকল্পনা। কেউ কেউ ধারণা করেন, লোহিত সাগরের সাথে এর কোন সংযোগ রয়েছে। কিন্তু এ ধারণাও যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা এখান থেকে লোহিত সাগরের দূরত্ব প্রায় ৭৫ কিলোমিটার। আর সংযোগ যদি থাকতই, তাহলে মক্কায় আরো কূপ থাকা আবশ্যক ছিল।

মিউজিয়ামে সংরক্ষিত যমযম কূপ থেকে পানি তোলার বালতি

কাবাগৃহ থেকে ২১ মিটার (৬৬ ফুট) পূর্বদিকে যমযম কূপের অবস্থান। পূর্বে দড়ি/বালতি দিয়েই এ কূপ থেকে পানি তোলা হত। ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম এ কাজের জন্য ইলেক্ট্রিক পাম্প বসানো হয়। যা দ্বারা পানি উঠিয়ে ট্যাংকিতে জমা করা হত। বর্তমানে মাসজিদুল হারাম থেকে কিছুটা দূরে কুদাই মহল্লায় ১৫০০ ঘনমিটার আয়তনের এক বিশাল ট্যাংকারে যমযম পানি জমা করা হয় এবং সেখান থেকে সঊদী আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে পানি সরবরাহ করা হয়। মক্কাস্থ 'কিং আব্দুল্লাহ যমযম পানি বিতরণ কেন্দ্র' এর যাবতীয় দেখভাল করে থাকে। এছাড়া সঊদী ভূতাত্ত্বিক জরিপ কেন্দ্রের 'যমযম স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ সেন্টার' নামক একটি শাখা রয়েছে, যেটি সার্বক্ষণিক অত্যাধুনিক ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে যমযম কূপ পর্যবেক্ষণ করছে। ১৯৬১-৬২ সালে মাতাফের জায়গা প্রশস্ত করার সময় যমযম কূপটি মাতাফের নীচে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে স্থাপন করা হয় যেখানে নামার জন্য প্রশস্ত সিঁড়ি রয়েছে। তবে তাওয়াফের সমস্যার কারণে ভবিষ্যতে এই রাস্তাটি বন্ধ করে মসজিদে হারামের বাইরে থেকে ভিন্ন প্রবেশপথ তৈরীর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

যমযম কূপে পানির অবস্থান ভূমি থেকে ১০.৬ ফুট নিচে। সাধারণভাবে যমযম কূপ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ১১-১৮ লিটার পানি উত্তোলন করা হয়। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একবার টানা ২৪

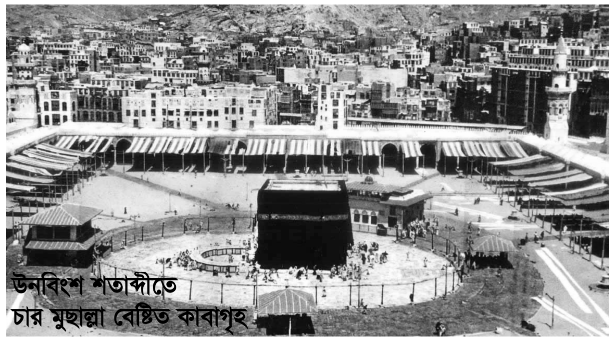

উনবিংশ শতাব্দীতে চার মুছাল্লা বেষ্টিত কাবাগৃহ

ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে প্রতি সেকেণ্ডে ৮০০০ লিটার পানি পাম্প করে উত্তোলন করা হয়। ফলে পানির লেভেল প্রায় ৪৪ ফিট নিচে নেমে যায়। কিন্তু পাম্প বন্ধ করার ১১ মিনিটের মধ্যেই পানি পুনরায় ১৩ ফুট উচ্চতায় চলে আসে। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ৪৮,০০০ লিটার বা প্রতি ঘণ্টায় ২৮.৮ মিলিয়ন লিটার বা এক দিনে ৬৯১.২ মিলিয়ন লিটার পানি উত্তোলন করার পরও মাত্র ১১ মিনিটে তা আবার পূর্ণ হয়ে যায়। এতে যমযম কূপের দু'টি অলৌকিকত্ব ফুটে উঠে। ১. যমযম কূপ থেকে যত পানিই উত্তোলন করা হোক না কেন তা কখনোই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। ২. আল্লাহ এখানে এমন এক শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা রেখে দিয়েছেন যে, অভ্যন্তরীণভাবে পানির প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও তা কখনো বাইরে ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে না। নতুবা মক্কা শহর পানির জোয়ারে ভেসে যেত।

মাসজিদুল হারাম :

মসজিদে হারাম বলতে কাবাগৃহকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার মাতাফ বা মুছাল্লাকে বুঝানো হয়। কাবাগৃহের সংস্কারের সাথে সাথে মসজিদে হারামেরও সম্প্রসারণ ঘটেছে অনেকবার। সর্বপ্রথম সংস্কার করেন ওমর (রাঃ)। নিম্নে মসজিদে হারামের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

(১) ওমর (রাঃ) কর্তৃক সম্প্রসারণ (৬৩৯ খৃঃ) :

ওমর (রাঃ) কাবাগৃহ সংলগ্ন বাড়ী-ঘর ক্রয় করে নিয়ে মসজিদে হারামের সীমানা বৃদ্ধি করেন এবং চতুর্পার্শ্বে প্রাচীর বানিয়ে দেন। তাওয়াফ এবং ছালাত আদায়ের সুবিধার্থে মাতাফের অসমান পাথুরে যমীনকে মসৃণ এবং সুবিস্তৃত করে দেন।

(২) আল-মাহদী কর্তৃক সম্প্রসারণ (৭৭৭ খৃঃ) :

ওমর (রাঃ) কাবাগৃহের পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্ব সম্প্রসারণ করলেও দক্ষিণ পার্শ্ব ইবরাহীমী উপত্যকার কারণে সম্প্রসারণ করতে পারেননি। কিন্তু হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এই সম্প্রসারণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অতঃপর আব্বাসীয় খলীফা আল-মাহদী দৃঢ়

সংকল্পবদ্ধ হয়ে এই পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ কাজ সুচারুরূপে পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন। ফলে সংকীর্ণ দক্ষিণপ্রান্তসহ মসজিদুল হারাম চারিপাশ নতুনভাবে সম্প্রসারিত করা হল। এই নির্মাণকাজ এতই সুদৃঢ় ছিল যে, তা সুদীর্ঘ আটশত বছর পর্যন্ত অক্ষত ছিল। এমনকি সেসময়কালে নির্মিত কিছু স্তম্ভ অদ্যাবধি টিকে আছে।

(৩) তুর্কী সুলতানগণ কর্তৃক সম্প্রসারণ (১৫৭১ খৃঃ) :

মসজিদে হারামের পূর্বপার্শ্বের ছাদে ফাটল দেখা দেয়ায় তুর্কী সুলতান সুলায়মান ১৫৭১ সালে মসজিদে হারাম নতুনভাবে সংস্কারের নির্দেশ দেন। প্রায় পাঁচ বছর পর সুলতান মুরাদের যুগে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে এ সংস্কারকার্য সুসম্পন্ন হয়। এসময় পুরাতন ভবনসমূহ সংস্কার ছাড়াও প্রথমবারের মত মাতাফের চতুর্পার্শ্ব জুড়ে ইমারত নির্মাণ করা হয়।

(৪) সঊদী সরকার কর্তৃক ১ম সম্প্রসারণ (১৯৫৩-১৯৮২ খৃঃ) :

সঊদী সরকারের সম্প্রসারণ কাজ শুরুর পূর্বে মসজিদে হারামের আয়তন ছিল মাত্র ২৯.০০ বর্গমিটার যাতে ৫০০০ মুছল্লীর সংকুলান হত। মাতাফের উপর ছিল অনেকগুলো কামরা। ফলে তাওয়াফের জায়গা ছিল সংকীর্ণ। কিন্তু দিন দিন হাজীদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। ফলে মসজিদ সম্প্রসারণ না করে উপায় ছিল না। আধুনিক সঊদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয শাসন ক্ষমতায় এসেই কাবাগৃহের উন্নয়নে ব্রতী হন। কাবাগৃহ সংস্কারের পাশাপাশি তিনি এ সময় মাসজিদুল হারামের সম্প্রসারণকার্যে হাত দেন। কিন্তু চূড়ান্ত কাজ শুরুর পূর্বেই ১৯৫৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তাঁর পুত্র সঊদের যুগে নির্মাণকাজ শুরু হয়। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে ৬২ কোটি রিয়ালের অধিক ব্যয়ে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়।

এই সম্প্রসারণ প্রকল্পে মসজিদে হারামের ইমারতকে নবআঙ্গিকে সুসজ্জিত করা হয়। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরো বৃদ্ধি করা হয়। হারামের ছাদকে এমনভাবে তৈরী করা হয় যেন ছাদের উপরও ছালাত আদায় করা যেতে পারে। সেখানে আলো ও পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়। এ সংস্কারের ফলে কেবল ছাদেই সোয়া লক্ষ মানুষের ছালাত আদায়ের স্থান সংকুলান হয়। ফলে এ দফায় সর্বমোট প্রায় সোয়া ৫ লক্ষ মুছল্লীর ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১ম সম্প্রসারণে হারামের সর্বমোট আয়তন দাঁড়ায় ২,০২,০০০ বর্গমিটার।

(৫) সঊদী সরকার কর্তৃক ২য় সম্প্রসারণ (১৯৮২-১৯৮৮ খৃঃ) :

বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয ক্ষমতায় আসার পর মসজিদে হারামের বাইরে ছালাত আদায়ের জন্য বিরাট চত্বর নির্মাণ করেন। এছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রসারণের বেশকিছু ত্রুটি সংস্কার করেন।

(৬) সঊদী সরকার কর্তৃক ৩য় সম্প্রসারণ (১৯৮৮-২০০৫ খৃঃ) :

এ সময় মাসজিদুল হারামকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্প্রসারণ করা হয়। বাদশাহ ফাহাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মসজিদে হারাম এক নান্দনিক সৌন্দর্যের আঁধার হয়ে ওঠে। ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় হারামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বৃদ্ধি করা হয়। হারামের ইমারত চারতলা বিশিষ্ট করা হয়। প্রতিটি তলায় মার্বেল পাথরের স্তম্ভ তৈরী করা হয়, যার সংখ্যা প্রায় ৫২০টি। প্রতিটির স্তম্ভের মধ্যে রাখা হয় এসির ঠাণ্ডা বাতাস বের হবার ছিদ্র। মসজিদ চত্বরে এবং ছাদের উপর ঠাণ্ডা পাথর স্থাপন করা হয়। চলাচলের সুবিধার জন্য লাগানো হয় চলন্ত সিঁড়ি। সম্প্রসারণের পর অভ্যন্তরীণ চত্বরসমূহের সমষ্টিগত আয়তন হয় ২,৭৮,০০০ বর্গমিটার এবং প্রায় ৬ লক্ষ ৯৪ হাযার মুছল্লীর একসাথে ছালাত আদায় করার স্থান সংকুলান হয়। চতুর্পার্শ্বে ৭৮,০০০ বর্গমিটার খোলা চত্বরে ছালাত আদায় করতে পারেন আরো ৩ লক্ষ ২০ হাযার মুছল্লী। ফলে ভিড়ের সময় এখানে অনায়াসে একত্রে ছালাত আদায় করতে পারেন ১০ লক্ষেরও বেশী মুছল্লী।

অন্যান্য তথ্য :

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যস্থলে নির্মিত মাসআ' :

কাবাগৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছাফা পাহাড় অবস্থিত। সেখান থেকে সোজা উত্তরে প্রায় অর্ধকিলোমিটার দূরে 'মারওয়া পাহাড়'। উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার সাঈতে প্রায় সোয়া তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। পূর্বে এ পাহাড়দ্বয় উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল। ১ম সঊদী সম্প্রসারণের সময় মাস'আ বা সাঈ করার স্থানটিকে ছাদযুক্ত করে সম্পূর্ণভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা হয়।

মাস'আর অভ্যন্তর ভাগ

হারামের দরজাসমূহ:

হারামের মূল দরজা ৪টি। বাব মালিক আব্দুল আযীয, বাব মালিক ফাহদ, বাব আল ফাতাহ এবং বাব আল-উমরাহ। এছাড়া আরো ২৫টির মত বহির্গমন দরজা রয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ প্রধান প্রধান দরজাসমূহ মিলিয়ে বর্তমানে দরজার সংখ্যা ১১২টিরও বেশী।

অযুখানা ও বাথরুম :

মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে প্রায় ১৪০০ বাথরুম এবং ১১০০টি অযুর কল রয়েছে। নারী-পুরুষের জন্য রয়েছে পৃথক ব্যবস্থা। এছাড়া বাইরেও বিভিন্ন স্থানে ওয়াশ রুম আছে।

গম্বুজ ও মিনার :

নবনির্মিত ইমারতে ২২৫ বর্গমিটার ব্যাসের ৩টি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে যার প্রতিটির উচ্চতা ১৩ মিটার। এছাড়া চারটি প্রধান গেইটে ২টি করে এবং সাফা পাহাড়ের উপরে ১টি মোট ৯টি মিনার রয়েছে। প্রতিটি মিনারের উচ্চতা ৮৯ মিটার। মিনারগুলির ভিতরে বৃত্তাকার সিঁড়ি করা রয়েছে যা দিয়ে উপরে উঠা যায়।

এয়ারকণ্ডিশন স্টেশন :

মসজিদে হারাম থেকে ৬০০ মিটার দূরে আজয়াদ রোডে অবস্থিত ৬ তলা বিশিষ্ট প্লান্ট থেকে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে মসজিদে হারামের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সঊদী সরকার কর্তৃক ৪র্থ সম্প্রসারণ (২০০৮-২০২০ খৃঃ) :

বর্তমানে প্রতি হজ্জ মওসুমে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমান হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় জমায়েত হচ্ছেন। তাছাড়া রামাযান মাসেও আগের তুলনায় বহুগুণ বেশী ওমরা আদায়কারী একত্রিত হন।

প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান হাজীদের এই বিপুল চাপ সামাল দেয়ার জন্য বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয ২০০৮ সালে মসজিদে হারামকে বর্ধিত করার জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'বাদশাহ আব্দুল্লাহ সম্প্রসারণ প্রকল্প' নামক এই প্রকল্পটির ২৫ ভাগ সম্পন্ন হবার পর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে বিগত ২০১১ সালের ১৯শে আগস্ট। ২০২০ সালে এ প্রকল্পের কাজ পূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। হারামের উত্তর প্রান্তে সাফা-মারওয়া সংযোগ সাবওয়ের বাইরে নতুন সম্প্রসারণটি করা হচ্ছে। যা মূলভবনের সাথে ৪টি ওভারব্রীজের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে। এতে মসজিদে হারামের আয়তন প্রায় ৪,০০,০০০ বর্গমিটারে পরিণত হবে (বর্তমান আয়তন ৩,৫৬,০০০ বর্গমিটার বা ৮৮.২ একর)। ফলে নতুন করে অতিরিক্ত প্রায় ১২ লক্ষ মুছল্লীর জন্য স্থান সংকুলান হবে। যার অর্থ প্রকল্প শেষে কাবাগৃহে একত্রে প্রায় ২৫ লক্ষ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। উত্তর দিক দিয়ে হারামে প্রবেশের জন্য 'বাব আব্দুল্লাহ' নামক নতুন একটি দরজাও নির্মাণ করা হচ্ছে যার উপর নতুন দু'টি মিনার সংযুক্ত হবে।

এছাড়া এ প্রকল্পে ছাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈ করার স্থানটি আরো সম্প্রসারিত করে প্রতিঘণ্টায় ৪৪ হাযারের পরিবর্তে ১ লক্ষ ১৮ হাযার হাজীর সাঈ করার ব্যবস্থা করা হবে। তাওয়াফকারীদের সুবিধার্থে মাতাফের উপর মসজিদে নববীর মত ছাতা স্থাপনেরও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

এই সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে হাজীদের জন্য বিশালাকার আবাসন ও যাতায়াত প্রকল্প। আবাসন প্রকল্পের অংশ হিসাবে মসজিদে হারামের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথ আব্দুল আযীয

মাসজিদুল হারামের ভবিষ্যত পরিকল্পনার ডামি চিত্র

গেইটের সম্মুখে ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে ৬০১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট 'মক্কা রয়েল ক্লক টাওয়ারস' যা বিশ্বের ২য় সর্বোচ্চ অট্টালিকা এবং সর্বোচ্চতম আবাসিক হোটেল। এই আবাসন প্রকল্পে মসজিদে হারামকে কেন্দ্র ঘিরে আরো প্রায় ১৩০টি সুউচ্চ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে ১৫০০ কোটি ডলার ব্যয় ধরা হয়েছে। ১৫ লক্ষ বর্গমিটার জুড়ে নির্মিত এই বিশাল আবাসন প্রকল্প বিশ্বের বৃহত্তম ফ্লোর প্লেস, যা আয়তনে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকেও অতিক্রম করেছে। এক লক্ষেরও বেশী হাজী এখানে আবাসিক সুবিধা পাবেন। মক্কা ক্লক টাওয়ারের শীর্ষদেশে চতুর্মূখীভাবে স্থাপন করা হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ঘড়ি (৪৩×৪৩ মিঃ) যা প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরত্ব থেকেও দেখা যায়।

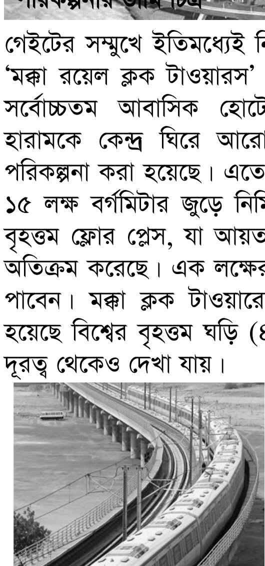

এছাড়া হাজীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ১০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মক্কা থেকে মিনা, মুযদালিফা, আরাফার মধ্যে অত্যাধুনিক রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। একই প্রকল্পে জেদ্দা থেকে মক্কা হয়ে মদীনা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শেষকথা :

দীর্ঘ ৫ সহস্রাধিক বছর পূর্ব হযরত ইবরাহীম (আঃ) বিশ্ববাসীর প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিবছর ঈমানদারগণ মক্কা মুকাররামার পুণ্যভূমিতে নিয়মিতভাবে হাযিরা দিয়ে যাচ্ছেন। হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাবাগৃহ ও মাসজিদুল হারাম তাই নিয়মিতভাবে সম্প্রসারণ করতে হয়েছে। তবে আধুনিক যুগে যাতায়াত ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি, নিরাপত্তা এবং উন্নত আবাসন ব্যবস্থাপনার কারণে হাজীদের সংখ্যা বৃদ্ধি বেড়ে চলেছে

মাসজিদুল হারামের বর্তমান চিত্র

কল্পনাতীতভাবে। এজন্য চলতি সম্প্রসারণ কার্যক্রমে হারাম শরীফের আয়তন প্রায় ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে সুপরিসর আবাসিক ভবন। হাজীদের সম্ভবপর সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সঊদী সরকারের আন্তরিকতায় কোন ঘাটতি নেই। শুদ্ধতার অভিযাত্রীদের সেবায় অকাতরে অর্থ ঢালছেন তারা। তবে এ কথা বলতেই হচ্ছে যে, নবনির্মিত মক্কা ক্লক টাওয়ারসহ আবাসিক ভবনগুলো মসজিদে হারাম থেকে এত নিকটবর্তী না হয়ে কিছুটা দূরে হওয়াটাই বাঞ্ছিত ছিল। কেননা নির্মিতব্য এই আবাসন প্রকল্পটি মক্কার আদি সৌন্দর্যকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে। জৌলুস আর বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য যেন সংযমের চাদর টেনে দিয়েছে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির সেই স্বতস্ফূর্ত অনাবিল আবেগ-অনুভূতির প্রকাশে। কাবাগৃহের মূল আকর্ষণ থেকে দৃষ্টি বিচ্ছিন্ন হবার অনেক উপকরণই হাযির করেছে এই সুউচ্চ ভবনগুলো। তবে এতসব কিছুর মাঝেও এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিভাত হয়, সারাবিশ্বের মুসলমানদের তাওহীদী চেতনার চিরন্তন কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিগত পাঁচ হাযার বছর ধরে যে মহা ঐতিহ্যের নিশান বহন করে চলেছে পবিত্র কাবাগৃহ, কালের বিবর্তনে তা কখনো ম্লান হবার নয়। কিয়ামত পর্যন্ত অব্যবহিতকাল ধরে তা যে এক জীবন্ত প্রেরণার উৎসধারা হয়ে থাকবে মুসলিম জাতির হৃদয় গহীনে, তা বলাই বাহুল্য।

সাক্ষাৎকার

*['বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে**'র এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর পক্ষ থেকে **মুযাফ্ফর বিন মুহসিন** ও **নূরুল ইসলাম**]*

তাওহীদের ডাক : থিসিস-এর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সার্ক দেশ সমূহে আপনি ৫২ দিনের স্টাডি-ট্যুরে গমণ করেছিলেন। এ সফরের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলুন।

আমীরে জামা'আত : দীর্ঘ ৩৪ বছর পরে স্মৃতি ভাণ্ডারের নীচে চাপা পড়ে যাওয়া বিষয়গুলি হাতড়িয়ে বের করে এনে পেশ করা নিতান্তই কঠিন বৈ-কি! তবুও যতদূর নিশ্চিতভাবে মনে করতে পারছি, সেগুলো বলছি–

১৯৮৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর পূর্বাহ্নে আমি সর্বপ্রথম ঢাকা তাকে পিআইএ ফ্লাইটে করাচীতে পা রাখি। ২৩ জন বাঙ্গালী ছাত্র আমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করে যাদেরকে আব্দুল মতীন ভাই আগেই বলে রেখেছিলেন। তারপর ওরা আমাকে গুলশান ইকবাল, ব্লক-৬, করাচী-৪৭ ইউনিভার্সিটি রোডে অবস্থিত জামে'আ সাত্তারিয়াতে নিয়ে যায়। সেখানকার মুদীর মাওলানা মুহাম্মাদ সালাফী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং মাদরাসার লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দেন। এটি ছিল 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রীয় মাদরাসা ও মসজিদ। প্রয়াত আমীর মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী (১৮৯৩-১৯৬৮খৃঃ)-এর নামানুসারে মাদরাসার নামকরণ করা হয়েছে। সঊদী অনুদানে সুরম্য ভৌতকাঠামো। জামে মসজিদ ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ ও জামে'আ সাত্তারিয়া ইসলামিয়াহ্র ভিত্তিপ্রস্তরে কা'বা শরীফের ইমাম ও খতীব শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সুবাইলের নাম দেখলাম। তারিখ : ১লা শা'বান ১৩৯৮ হিঃ শনিবার সকাল, মোতাবেক ৮ই জুলাই ১৯৭৮ খৃঃ। মুদীর মুহাম্মাদ সালাফী এ দিনই মাগরিবে আমাকে তাঁর বড় ভাই বর্তমান আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান সালাফীর কাছে নিয়ে গেলেন বান্স রোডে অবস্থিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসে। যাকে 'মারকাযী দারুল ইমারত জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' বলা হয়। যা 'মুহাম্মাদী মসজিদ' নামেও পরিচিত। এখানেও মসজিদ কেন্দ্রিক একটি ছোট মাদরাসা রয়েছে। একটি ডেস্কের সামনে মেঝেতে রাখা গদীতে বসে মাওলানাকে লেখায় ব্যস্ত অবস্থায় পেলাম। সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হ'লাম। ২৬.১২.৮৮ইং তারিখে বিদায়ের দিন পুনরায় তাঁর কাছে গিয়ে দো'আ নিয়ে আসি। এ সময় মুদীর মুহাম্মাদ সালাফী ছাড়াও দুই বাংলাদেশী ছাত্র নূরুল ইসলাম (শেখর, ফরিদপুর, বর্তমানে আড়ুয়াবর্ণি, বাগেরহাট) এবং ফযলুর রহমান (দর্জিপাড়া, হারাগাছ, রংপুর) আমার সাথে ছিল। মাওলানা তাঁর লিখিত কিছু বই এবং তাঁদের মুখপত্র পাক্ষিক 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' পত্রিকা উপহার দিলেন। যার আমি পূর্ব থেকেই নিয়মিত পাঠক ছিলাম। জামেয়া সাত্তারিয়ায় অনেক বাংলাদেশী ছাত্র পেলাম। যেমন নূরুল্লাহ (ঘোনা, সাতক্ষীরা), নূরুল ইসলাম (শেখর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর), তার ভাই সাঈদুর রহমান (ঐ), বাকী বিল্লাহ (চরকান্দী, মোল্লাহাট, বাগেরহাট), ফযলুর রহমান (হারাগাছ, রংপুর), জসীমুদ্দীন (রাজশাহী), ইউসুফ আলী (সাঘাটা, গাইবান্ধা), রফীকুল ইসলাম (দিকপাইত, সরিষাবাড়ী, জামালপুর), মাহমূদ, আবূবকর, মাহবুব, ইউনুস, আশফাক্ব, আব্দুল হক (রংপুর) প্রমুখ। জামে'আ সাত্তারিয়ার ছাত্ররা আমাকে উষ্ণ আতিথেয়তায় মুগ্ধ করে। আমি তাদের জন্য দো'আ করি।

পরের দিন মাওলানা মুহাম্মাদ সালাফী তাঁদের গাড়ীতে করে আমাকে পার্শ্ববর্তী জামে'আ আবূবকর আল-ইসলামিয়াহ (গুলশান ইকবাল, ব্লক-৬, করাচী, প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৮)-য়ে নিয়ে যান। এটি 'জামা'আতে মুজাহেদীন পাকিস্তান' কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রীয় মাদরাসা। পূর্বেরটির চাইতে এটি আধুনিক ভৌতকাঠামো ও সাজ-সজ্জায় অধিক উন্নত। লাইব্রেরীটাও বেশ সমৃদ্ধ। জামা'আতে মুজাহেদীনের নায়েবে আমীর ও করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা যাফরুল্লাহ ও প্রচার সম্পাদক মাওলানা ইয়াহইয়া আযীয তাঁদের কেন্দ্রীয় অফিসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। একই এলাকায় আহলেহাদীছের দু'টি সংগঠনের দু'টি মারকায ও দু'টি বৃহৎ মাদরাসা। দু'টিই চলছে ভালভাবে দেশী-বিদেশী অনুদানে। দুই সংগঠনের নেতাদের মধ্যে কোন রেষারেষি দেখলাম না। আমার থিসিসের বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ ওনাদেরকে খুবই উৎসাহিত করেছিল। মাদরাসা ও লাইব্রেরী পরিদর্শন শেষে খাবার টেবিলে বসে খুশীতে উচ্ছল অধ্যাপক যাফরুল্লাহ আমাকে বললেন, ভাই! আপনার নাম শুনে আমরা গর্ব অনুভব করছি। আপনার ভাইবোনদের নামগুলো একটু বলুন তো? বললাম, আব্দুল্লাহিল বাকী, নূরুল্লাহিল কাফী, আমানুল্লাহিশ শাফী, ওবায়দুল্লাহিল ওয়াফী এবং আমি আসাদুল্লাহিল গালিব। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে প্রথম ও শেষ আমরা দু'ভাই বেঁচে আছি। বাকী তিন ভাই মারা গেছেন বড় হয়ে। বোনেরা হলেন, ফাতিমা, আয়েশা, জামীলা, হালীমা। নামগুলো শুনে বেচারা পাকিস্তানী গলায় এমন জোরে 'সুবহানাল্লাহ' বলে উঠলেন যে, আমি চমকে ওঠার উপক্রম। বললেন, *এহ্ তো নবী কা ঘর হ্যায়* (এ যে নবীর পরিবার)? বললেন, আমাদের ধারণা ছিল, বাংলাদেশে অধিকাংশ হিন্দুয়ানী নাম। কিন্তু এখন দেখছি, আপনাদের নাম পাকিস্তানীদের এমনকি আরবদের চাইতেও ভাল। পরবর্তীতে ২৬-২৮শে আগষ্ট'৯৩ কলম্বোতে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী ১ম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং একই হোটেল হিলটনে ছিলাম। জামে'আ আবূবকরেও বাংলাদেশী ছাত্র আব্বাস, তাওহীদুল ইসলাম (নাচুনিয়া, তেরখাদা, খুলনা), মুনীরুদ্দীন (বর্তমানে মৃত) (পটুয়াখালী) প্রমুখকে পেলাম।

জামে'আ সাত্তারিয়াতে লক্ষ্য করলাম যে, সন্ধ্যায় ক্যাম্পাস প্রায়ই ফাঁকা থাকে। একদিন রাতে বাঙ্গালী ছেলেদের জিজ্ঞেস করলে তারা চুপে চুপে বলে যে, আমরা প্রায়ই মিছিলে যাই। মিছিল প্রতি আমরা প্রত্যেকে গড়ে ৪০০/৫০০ টাকা আয় করি। যেকোন দলের মিছিল হৌক, কোন সমস্যা নেই। তবে বড় দলের মিছিলে টাকা বেশী। সবাই আমাদের চুক্তিমতে টাকা দেয়।

আরেকদিন এক বাঙ্গালী ছাত্র আমাকে তার বাসায় দাওয়াত খাওয়াতে নিয়ে গেল। বাসায় সে একা। দু'জনে খাচ্ছি। এমন সময় বাইরে গাড়ীর একটানা হর্ণ। খাওয়া ফেলে সে বাইরে গেল। কিছু পরে ফিরে এল। অতঃপর ঝটপট প্রস্তুতি সেরে আমাকে বলল, স্যার! একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি। বলেই সে গাড়ীতে উঠে মিলিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ থ' হয়ে বসে থেকে অবশেষে হাতমুখ ধুয়ে একাকী চুপচাপ বসে রইলাম। ঘণ্টা পার হয়ে গেলে সে এল একং ক্ষমা

চাইল। জিজ্ঞেস করে জানলাম, সে এক বাড়ীতে তাবীয দিয়ে এল এবং আশাতিরিক্ত টাকা সে পেয়েছে। বললাম, তোমরা এগুলো কীভাবে করছ? বলল, জামা'আতে গোরাবা এটাকে জায়েয বলেন। আর তাবীযের উপরে বিশ্বাস ধনী লোকদের সবচেয়ে বেশী। ঔষধ-পত্র যাই-ই খাওয়ান না কেন, তাবীয ছাড়া রোগ সারবে না, এটাই এদের বদ্ধমূল ধারণা। এজন্য তারা হুযুরদের ও মাদরাসার ছাত্রদের পিছনে পানির মত টাকা ঢালে।

২৪.১২.৮৮ ইং তারিখে করাচীর সর্বাধিক প্রাচীন আহলেহাদীছ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামে'আ দারুলহাদীছ রহমানিয়া'তে গেলাম। মাদরাসাটির সাথে বড় একটি মসজিদ রয়েছে। যা 'সফেদ জামে মসজিদ' নামে খ্যাত। এটি সোলজার বাযার, করাচী-৩-য়ে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর মুদীর বা অধ্যক্ষ হ'লেন খ্যাতনামা বাগ্মী শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী, যিনি আমার সমবয়সী। ওখানে গিয়ে অনেক বাংলাদেশী ছাত্র পেলাম। যেমন আব্দুল হাই (জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা), আহমাদ আলী (চিতলমারী, বাগেরহাট), হাফেয আখতার (শিম্বা, রাণীনগর, নওগাঁ), আলী আকবর, জাহিদুল ইসলাম (নাচুনিয়া, তেরখাদা, খুলনা, বর্তমানে মৃত), আসাদুযযামান (গাযীপুর, তেরখাদা), তরীকুল ইসলাম (হাড়িখালি, তেরখাদা), আলমগীর হোসায়েন (কাপাসিয়া, গাযীপুর), হাবীবুর রহমান (সারুলিয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট), আমীরুল ইসলাম (সুতারখালি, দাকোপ, খুলনা) প্রমুখ। এদিন বাদ মাগরিব শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানীর অফিসে গেলাম। এটাই তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি খুবই খুশী হলেন এবং আমাকে অনেক মূল্যবান বই উপহার দিলেন। যা আমার থিসিসের জন্য খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়েছিল। তাছাড়াও তাঁর মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররাও আমাকে অনেক বই হাদিয়া দেন। আল্লাহ সকলকে উত্তম জাযা দান করুন!

পরদিন ২৫.১২.৮৮ইং শুক্রবার করাচীর সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ 'কোর্ট মসজিদে' গেলাম জুম'আ পড়তে। পাকিস্তানের বড় বড় বাগ্মীগণ এখানে বিভিন্ন সময় খতীবের দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐদিন খুৎবা দিলেন তেজস্বী খতীব মাওলানা আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী। ছালাত শেষে তাঁর ও শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানীর সাথে সাক্ষাৎ হ'ল।

২৬.১২.৮৮ইং তারিখে বিকালে আমি করাচী থেকে লাহোরের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী 'শালিমার' ট্রেনে একাকী রওয়ানা হই এবং ১৮ ঘণ্টার সফর শেষে পরদিন সকালে লাহোর পৌঁছি। রফীকুল ইসলাম (দিকপাইত, জামালপুর) ট্রেনে উঠে আমার সীট ঠিক করে দেয় ও লাগেজ সাজিয়ে দেয়। আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করুন!

লাহোর : এখানে আমার গন্তব্যস্থল ছিল ৩১, শীশ মহল রোডে অবস্থিত সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' অফিস। যে পত্রিকার আমি বহু পূর্ব থেকেই নিয়মিত পাঠক ছিলাম। এ পত্রিকায় (৩৫/৩৫ সংখ্যা) ১৯৮৪ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মতৎপরতা বর্ণনা করে লেখা আমার একটি পত্র হুবহু পূর্ণ এক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। এরপরেও অনেকগুলি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। যেজন্য তাদের কাছে আমার পূর্ব পরিচিতি ছিল। পত্রিকাটি দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ্র মুখপত্র হিসাবে বের হয়। তিনতলা এই বিল্ডিংটির মালিক হ'লেন সুনানে নাসাঈ-র আরবী ভাষ্যকার খ্যাতনামা আলেম মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী অমৃতসরী (১৩২৭-১৪০৮হিঃ/১৯০৯-১৯৮৭ খৃঃ)। এখন তাঁর ছেলে হাফেয আহমাদ শাকির এটির মালিক। এখানে মাকতাবা সালাফিইয়াহ নামে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী আছে। যেটা ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ। এখানে গিয়ে প্রথম দিনেই পেয়ে গেলাম উক্ত লাইব্রেরীর খ্যাতনামা গবেষক হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, হাফেয নাঈমুল হক নাঈম, আল-ই'তিছাম সম্পাদক শায়খ আলীম নাছেরী প্রমুখ বিদ্বানবর্গকে। বিকালে এলেন এক সময় আল-ই'তিছামে সম্পাদক ও বর্তমানে ২, ক্লাব রোড, লাহোরে অবস্থিত ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়াহ্র পরিচালক ও গবেষণা মাসিক 'আল-মা'আরেফ' (উর্দূ)-এর সম্পাদক উপমহাদেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি। তাঁদের সাথে বৈঠকে আমি আমার সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলাম। তাঁরা খুবই খুশী হলেন। মাওলানা ইসহাক ভাট্টি তাঁর 'ফুক্বাহায়ে হিন্দ ও পাক' সব খণ্ড হাদিয়া দিলেন। হাফেয আহমাদ শাকের তাঁর লাইব্রেরীর চাবি আমাকে দিলেন এবং দিনরাত লাইব্রেরীতে থেকে পড়াশুনার ও ফটোকপি করার অবারিত সুযোগ দিলেন। দিনের বেলায় গবেষণা কাজে হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ ও নাঈমুল হক নাঈম আমাকে সাহায্য করতেন। রাতের বেলায় প্রায় সারারাত ধরে কিতাব বাছাই করতাম। এখানে পার্শ্ববর্তী তাক্বভিয়াতুল ইসলাম মাদরাসার বাংলাদেশী ছাত্র হাফেয মুনীরুদ্দীন (বর্তমান মৃত) (কুমীরডাঙ্গা, তেরখাদা, খুলনা) আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন ও উত্তম জাযা দান করুন!

এখান থেকে নাওশাহরাবীর 'হিন্দুস্তান মেঁ আহলেহাদীছ কি ইলমী খিদমাত' (পৃঃ ২৪৫), শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর 'তাফহীমাতে ইলাহিইয়াহ' তাঁর 'অছিয়াতনামা', আবুল হাসান আশ'আরীর 'মাক্বালাতুল ইসলামীঈন' বইয়ের আহলেহাদীছ-এর বর্ণনা অংশ (পৃঃ ৩২০-২৭) সহ অনেকগুলি বই ফটো করি। মাকতাবা সালাফিইয়াহ থেকে অনেক বই কিনি। তাঁরা আমাকে তাঁদের প্রকাশিত আর-রাহীকুল মাখতূম (উর্দূ) বইটি হাদিয়া দেন। লাহোরের 'রহমান মার্কেট' আহলেহাদীছ-এর সবচেয়ে বড় বইয়ের মার্কেট। সেখান থেকে অনেক বই কিনলাম। নিষিদ্ধ ফলের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বভাবজাত। তাই আমার যিদ চেপে বসল পাক সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হাকীম আশরাফ সিন্ধূ রচিত 'মিক্বইয়াসে হাক্বীক্বত' বইটি (পৃঃ ৪৩৪) সংগ্রহ করব। লেখকের ছেলের দোকানে গেলাম। মোটেই রাযী নয়। কিন্তু খাতির জমিয়ে ফেললাম। অবশেষে সে বাড়ীতে চলে গেল এবং অনেক পরে উপরের কভার ছিঁড়ে লুকিয়ে এনে আমাকে বইটি দিয়ে বলল, 'শিগগীর চলে যান। পয়সা লাগবে না'।

এখানে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা বলি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে 'মাক্বালাতুল ইসলামীঈন' বইটি ছিল। কিন্তু ঐ ৪টি পাতা আমি কাটা পেয়েছিলাম। ফলে আমি ঐ পাতা কয়টি ফটো করে এনে লাইব্রেরীতে দিলাম। পরে খোঁজ নিয়ে দেখি যে এবারে আস্ত বইটিই গায়েব। লিখিত অভিযোগ করে এবং এসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ানকে সাথে নিয়ে নিজে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বইটি এযাবত পাওয়া যায়নি। আহলেহাদীছের প্রতি হিংসা যাদের, এটা যে সেইসব শিক্ষকদের কাজ, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

৩১.১২.৮৮ইং তারিখে গেলাম ১০৬, রাভী রোডে অবস্থিত 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর কেন্দ্রীয় অফিসে (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৮)। সেখানে তখন উপস্থিত সহ-দফতর সম্পাদক ছাবের নিযামীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করলাম। তিনি আমাকে কিছু যরূরী বই ও তাঁদের সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ লাহোর' কয়েক কপি হাদিয়া দিলেন।

একইদিনে গেলাম আরেকটি আহলেহাদীছ সংগঠন 'জামা'আতে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' (প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৩১) অফিসে। পাঞ্জাবের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা আব্দুল্লাহ রৌপড়ী (১৮৮৪-১৯৬৪) প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস লাহোরের চকদালগেরাঁ মসজিদে কুদ্সে অবস্থিত। মাওলানা আব্দুল কাদের রৌপড়ী বর্তমানে আমীর। এ সংগঠনের সাপ্তাহিক মুখপত্র হ'ল 'তানযীমে আহলেহাদীছ'। আমি গিয়ে তাঁকে পাইনি। তবে অফিস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়ে আসি।

১.১.১৯৮৯ ইং তারিখে গেলাম আল্লামা ইহসান ইলাহী যাহীর (১৯৪০-১৯৮৭) প্রতিষ্ঠিত 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' কেন্দ্রীয় অফিসে। যা ৫০ লোয়ার মাল, লাহোরে অবস্থিত। সেখানে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আল্লামা যাহীরের হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবী সম্বলিত বোর্ড দেখলাম। যাতে লেখা রয়েছে, *'শহীদে ইসলাম আল্লামা ইহসান ইলাহী যাহীর কে ক্বাতেলূঁ কো ফাঁসি দো' মিন জানেবে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ লাহোর'*। তাঁর আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করে আমার প্রেরিত উর্দূ পত্রটি হুবহু তাদের মুখপত্র 'মুমতায ডাইজেস্টে' প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক প্রফেসর সাজেদ মীর সেটা আমাকে হাদিয়া দিলেন। সাথে অন্যান্য বই ও পত্রিকা দিলেন। এসময় যাহীরের নাবালক সন্তান সম্ভবতঃ এখনকার তেজস্বী তরুণ বক্তা ইবতেসাম ইলাহী যাহীরকেও দেখলাম ও কাছে ডেকে আদর করলাম। পরবর্তীতে ১২.১.১৯৯৮ইং তারিখে রিয়াদে তার চাচা খ্যাতনামা আলেম ও শিক্ষাবিদ ডঃ ফযলে ইলাহীর বাসায় গেলে সেখানে তার সাথে পুনরায় দেখা হয় এবং তখন সে নিজ হাতে মুমতায ডাইজেস্ট এনে উক্ত পৃষ্ঠা বের করে আমাকে দেখায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মাসিক তারজুমানুল হাদীছ, মুমতায ডাইজেস্ট, সাপ্তাহিক আল-ইসলাম এই সংগঠনের নিয়মিত পত্রিকা হিসাবে চালু আছে।

এর আগে ২৭.১২.৮৮ইং তারিখে আমি মাওলানা ইসহাক ভাট্টির অফিসে (২, ক্লাব রোড, লাহোর) যাই এবং তাঁর কাছ থেকে বিশেষ করে পাকিস্তানে আহলেহাদীছ সংগঠনগুলির রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপরে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য গ্রহণ করি। তিনি তাঁর সম্পাদিত মা'আরিফ মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য বই-পত্র হাদিয়া দেন। সম্ভবতঃ একই দিনে চীনাওয়ালী মসজিদ দেখতে যাই। যা লাহোরের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বলে খ্যাত। ইহসান ইলাহী যাহীর ছাড়াও অন্যান্য খ্যাতনামা আলেমগণ এখানে খতীব ছিলেন।

সফরের শেষ পর্যায়ে ২.১.১৯৮৯ইং তারিখ রাতে হাফেয আহমাদ শাকির তাঁর বাড়ীতে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। খাওয়ার সময় সামুদ্রিক মাছের প্রায় ২৫০ গ্রাম ওযনের একটি বিরাট টুকরা দেখে তো আমি থ'। বললেন, আপনি বাঙ্গালী বলেই তো বাযার থেকে মাছ কিনে এনেছি। নইলে আমরা কাঁটা ফোটার ভয়ে মাছ খাই না। তারপর রসিকতা করে বললেন, *'হাম সুনতে হ্যাঁয় কেহ বাংগালী লোগ কাঁটা চিবা কে খা লেতে হ্যাঁয়'* (আমরা শুনি যে, বাঙ্গালীরা কাঁটা চিবিয়ে খেয়ে নেয়'?)। দুঃসাহসী পাঠান জাতির এই মাছের কাঁটা ভীতি সত্যি উপভোগ্য বৈ-কি!

'উপমহাদেশে ওলামায়ে আহলেহাদীছ' নামে ২৮৯ জন আলেমের জীবনী সংবলিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আমাকে উপহার দেন জনৈক আলেম। এই মুহূর্তে আমি যার নাম ও ঠিকানা মনে করতে পারছি না। সংক্ষিপ্ত ডায়েরীটাও খুঁজে পাচ্ছি না। মূল্যবান এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী আলেমের জীবনীও আছে। হাদিয়া দাতা আশা করেছিলেন এটা আমরা ছেপে প্রকাশ করব। আল্লাহ্‌র রহম হলে এবং তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পারলে নিশ্চয়ই আমরা খুশী হব।

পরদিন সকালে ওনার ছেলে হাম্মাদ শাকির আমাকে গাড়ীতে করে দিল্লীর পথে লাহোর এয়ারপোর্টে রেখে গেল। ১৪দিন অবস্থান ও মেহমানদারীর জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি বিমানের প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে প্রবেশ করলাম। এভাবে আমার দু'সপ্তাহের পাকিস্তান সফর শেষ হ'ল এবং ভারত সফর শুরু হ'ল।

ব্যক্তিত্বগঠন

৩টি জিনিস থেকে মুক্ত থাকুন :
প্রতারণা, পশ্চাতে নিন্দা, অপচয়।
৩টি জিনিস থেকে দূরে থাকুন :
হিংসা, ক্ষতি করা, অধিক কৌতুকপ্রিয়তা।
৩টি জিনিসকে ধ্বংস করুন :
লোভ, স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস।
৩টি জিনিসকে প্রশ্রয়দানে বিরত থাকুন :
অসৎকর্ম, অসৎসঙ্গ, অসৎচিন্তা।
৩টি বিষয়ে দেরী করা থেকে সতর্ক থাকুন :
ছালাত, অঙ্গীকার, ঋণ।

৩টি জিনিসকে সর্বদা হেফাযতে রাখুন :
জিহ্বা, অন্তর, মেযাজ।
৩টি জিনিসকে সর্বদা রক্ষা করুন :
দ্বীন-ধর্ম, মর্যাদা, দেশ।
৩টি জিনিসের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন :
জ্ঞান, হালাল উপার্জন, সৎআমল।
৩টি অভ্যাস সর্বদা বজায় রাখুন :
হাস্যোজ্জ্বলতা, সালাম, নিয়মানুবর্তিতা।
৩টি জিনিসকে সর্বদা পরীক্ষা মনে করুন :
বয়স, সুস্বাস্থ্য, সম্পদ।

৩টি জিনিস খুব সৌন্দর্যপূর্ণ :
ভালোবাসা, নিশ্চুপ থাকা, ক্ষমা করা।
৩টি জিনিস অত্যাবশ্যক :
মৃত্যু, বাতাস, পানি।
৩টি জিনিস খুব অপছন্দনীয় :
মিথ্যাচার, বোকামী, অহংকার।
৩টি জিনিস খুব প্রিয়তর :
তাক্বওয়া, স্পষ্টবাদিতা, সৎসাহস।
৩টি জিনিস খুব মর্যাদাকর :
বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, পরিশ্রম।

মিসরে সালাফীদের উত্থান : প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা

আব্দুল আলীম

[২০১১ সাল জুড়ে আরব বিশ্বে ঘটে যাওয়া অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাবিশ্বে আলোচনার ঝড় বইছে। বিশ্লেষকগণ একে 'আরব বসন্ত' আখ্যা দিয়ে এর পশ্চাতে নানা কারণ, উপকরণ বিশ্লেষণে ব্যস্ত রয়েছেন। দৃশ্যত এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দীর্ঘদিনের একনায়কতন্ত্র তিরোহিত হয়ে এবার গণতন্ত্রের মুখ দেখতে যাচ্ছে আরব বিশ্ব। তবে অধিকাংশের আশংকা, কট্টর মৌলবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছে আরব। মৌলবাদ বলতে কেবল ইসলামী গণজাগরণ নয় বরং সংস্কারপন্থী সালাফী আন্দোলনের রাজনৈতিক উত্থানই যে তারা বড় করে দেখছে, তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে সালাফী আন্দোলনের অকস্মাৎ গতি পরিবর্তন তথা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বিষয়টি স্বয়ং সালাফীদের মাঝেই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কেননা ইসলামের মৌল আক্বীদা ও বাস্তবতার নিরিখে প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনব্যবস্থাকে অধিকাংশ সালাফী সংগঠন হারাম মনে করে থাকেন। সর্বোপরি মিসরে সালাফীদের এই উত্থান সর্বমহলেই এক আলোচিত বিষয়। মিসরের সমাজ গবেষণা সংস্থা 'আল-মারকাযুল আরাবী লিদ্-দিরাসাতিল ইনসানিইয়াহ' এ বিষয়ে একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছে যাতে মিসরে সালাফীদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। নিবন্ধটি আরবী থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুল আলীম বিন কাওছার আলী। পরিশিষ্ট অংশে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে–নির্বাহী সম্পাদক]

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মিশরীয় সমাজ অনেক রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক আন্দোলনের সাক্ষী হয়েছে। ২০১১ সালে ২৫ই জানুয়ারীতে পরিদৃষ্ট হয়েছে যার অকস্মাৎ বিস্ফোরণ। যার চূড়ান্ত দৃশ্য মঞ্চায়িত হয়েছে ২০১১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী। এই বিপ্লব দীর্ঘ ৩০ বছরের ক্ষমতাসীন মিসরীয় নেতা হুসনী মোবারককে এক নিমিষে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক সকল শক্তি এই বিপ্লব থেকে ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করেছে সাধ্যমত। আমরা এই নিবন্ধে ২৫শে জানুয়ারীর বিপ্লবে সালাফীদের অবস্থান তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মিসরে সালাফীদের পরিচয়

মিসরসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সালাফীদের ধর্মীয় অবস্থান যথেষ্ট উঁচুতে। পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ থেকে দ্বীনী ভিত্তি গ্রহণ, সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী স্বচ্ছ আক্বীদার অনুসরণ এবং যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে তাদের রয়েছে সুদৃঢ় অবস্থান। এতদসত্ত্বেও দুঃখজনক বিষয় যে, তারা এক ও অভিন্ন দল বা বলয়ে সুসংঘবদ্ধ নয়; বরং দৃঢ় একটি কেন্দ্রবিন্দু থাকা সত্ত্বেও তারা নানা দল-উপদলে বিভক্ত। ফলে সামাজিক পরিমণ্ডলে তাদের মযবূত কোন অবস্থান পরিদৃষ্ট হয় না। তবে অতি সম্প্রতি মিডিয়ার বদৌলতে সালাফীরা মিশরীয় সমাজে তাদের বেশ একটা মযবূত অবস্থান অবলোকন করছে। নিম্নে মিশরে সালাফীদের উপস্থিতি ও তাদের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল–

মিসরের স্বীকৃত সালাফী সংগঠন এবং সংস্থাসমূহ

১. আল-জাম্ঈয়াহ আশ-শারঈয়াহ : শায়খ মাহমূদ খাত্ত্বাব সুবকী এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯১২ সালে 'আল-জাম্ইয়াহ আশ-শারইয়াহ লিতা'আউনিল আমিলীনা বিল-কিতাবি ওয়াস্-সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিইয়া' নামে এই সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করেন। নামটির অর্থ হচ্ছে, 'পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাতে মুহাম্মাদীর অনুসারীদের পারস্পরিক সহযোগিতার শরঈ সংগঠন'। মিশরে উপনিবেশের ফলে মানুষের জীবন থেকে ইসলামী শরী'আত দিনে দিনে দূরে সরতে থাকায় এবং শিক্ষাব্যবস্থার মোড় পরিবর্তন ঘটায় তিনি এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমা সংস্কৃতির কালো থাবা, নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী শরী'আতের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া এবং নানা বিদ'আত ও কুসংস্কারের ব্যাপক প্রসারও শায়খ সুবকীর এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল।

এই সংগঠনের শাখা সারা মিশর জুড়ে ছড়িয়ে আছে। মিশরের জনকল্যাণমূলক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের মধ্যে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সুপরিচিত। গোটা মিশরে এর ৩৫০টিরও বেশী শাখা আছে। বর্তমান সংগঠনটির প্রধান হচ্ছেন ড. মুহাম্মাদ মুখতার মুহাম্মাদ আল-মাহদী। তিনি একজন আযহারী আলেম।

আক্বীদা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম : এই সংগঠন দ্বীনকে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় এবং কবরে ছালাত আদায় করা, কবরে মানত করা, এর মাধ্যমে বরকত কামনা ইত্যাদি গর্হিত অপরাধের বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। স্বভাবতই তারা নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের দিকে আহ্বান জানানোর বিরোধী। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মাহমূদ বিরচিত 'আদ-দ্বীনুল খালেছ' এই সংগঠনের দাঈদের মূল রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। এই গ্রন্থটিকে একটি ফিক্বহী বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে, যেখানে দলীলসহ ফিক্বহী অভিমতসমূহ বর্ণিত হয়েছে এবং দলীলের ভিত্তিতে সর্বাধিক অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমতটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সংগঠন মনে করে, দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আতই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্র বড় সমস্যা। দ্বীনকে কলুষমুক্ত করতে পারলেই মুসলিম জাতি তার হারানো সম্মান এবং মর্যাদা ফিরে পাবে। এতদ্‌সত্ত্বেও শায়খ সুবকী আল-আযহারের ছূফী পরিবেশে বেড়ে উঠায় ছূফীদের বিরুদ্ধে এই সংগঠন ততটা খড়গহস্ত নয়। তারা ছূফীদেরকে দুইভাগে ভাগ করেছে– ১. মধ্যপন্থী : যারা সুন্নাতের অনুসরণ করে। ২. চরমপন্থী : যাদের মধ্যে আক্বীদাগত এবং ফিক্বহী পথভ্রষ্টতা বর্তমান। এর প্রথম দলটির প্রতি তারা সহানুভূতিশীল মনোভাবাপন্ন।

শায়খ সুবকী প্রচলিত রাজনীতি থেকে দূরে থেকে সুশৃংখল সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্য সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন রাজনৈতিক ইস্যুতে এই সংগঠন নাক গলায় না। সম্ভবত: এ কারণেই সংগঠনটি আজও টিকে আছে এবং সরকারও তাদের কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করেনি। তবে কেউ কেউ মনে করেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সংগঠনটি রাজনীতির দিকে মোড় নিয়েছে যা সংগঠনের মুখপত্র 'আত-তিবইয়ান' পত্রিকায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে শায়খ সুবকীর রাজনীতি থেকে দূরে থাকার নীতি এখন আর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে।

সংগঠনের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ :

১. শায়খ মাহমূদ মুহাম্মাদ খাত্ত্বাব সুবকী : সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা।

২. শায়খ আমীন মাহমূদ মুহাম্মাদ খাত্ত্বাব সুবকী : তিনি শায়খ সুবকীর সন্তান ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সংগঠনের প্রধানের পদ অলংকৃত করেন। তিনিও আমৃত্যু সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

৩. শায়খ আব্দুল লত্বীফ মুশতাহিরী : প্রতিষ্ঠাতা প্রধানের পর তিনিই হচ্ছেন সংগঠনের প্রসিদ্ধতম নেতা।

৪. মুহাম্মাদ মুখতার মাহদী : বর্তমান প্রধান।

২. জামা'আতু আনছারিস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিইয়াহ :

মিসরের প্রখ্যাত শায়খ মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফিকীর হাতে রাজধানী কায়রোতে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শায়খ আল-ফিকী আযহারের রক্ষণশীল পরিবেশে বড় হন এবং পরবর্তীতে সেখানকার একজন আলেম হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী নেওয়ার পর তিনি দা'ওয়াতী ময়দানে নেমে পড়েন। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি আহ্বান এবং ছহীহ সুন্নাহ সংরক্ষণের পক্ষে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম শীঘ্রই প্রসার লাভ করে এবং তাঁর বহু অনুগামী সৃষ্টি হয়। শায়খ আল-ফিকীর মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন আলেম এই সংগঠনের প্রধানের পদ অলংকৃত করেন। ১৯৬৯ সালে মিশরীয় সরকার 'আনছারুস সুন্নাহ' সংগঠনের অনুমোদন বাতিল করে 'আল-জাম'ঈয়াতুশ শারঈয়াহ'-এর সাথে একত্রিত করে দেয়। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এভাবে সংগঠনটির কার্যক্রম চলতে থাকে। অতঃপর রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা উদারনৈতিক ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে ২য় প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শায়খ রাশাদ শাফেঈ'র হাত দিয়ে সংগঠনটি আবার ডিক্লারেশন ফিরে পায়। মিসরের প্রত্যেকটি বড় বড় অঞ্চলে এই সংগঠনের শাখা ছড়িয়ে পড়ে। মিসরে এর প্রায় ১০০টি শাখা এবং ১০০০টি মসজিদ রয়েছে।

সংগঠনের আক্বীদা ও কার্যক্রম :

মানুষকে যাবতীয় শিরক-বিদ'আত থেকে নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান, সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসরণ, মানুষকে কিতাব ও সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করানো এবং যাবতীয় বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে বিরত রাখাই এ সংগঠনটির কার্যক্রম ছিল। পূর্বতন 'আনছারুছ ছুন্নাহ'-এর মত এ সংগঠনটিরও সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, ইসলাম একাধারে ধর্ম এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থা, ইবাদত এবং শাসনকার্য পরিচালনার নাম। কিন্তু সংগঠনের মুখপাত্রগণ মিসরের পরিবেশে সমস্যাপূর্ণ–এমন কোন বিষয়ে সাধারণত আলোচনা করতেন না বা রাজনৈতিক কোন বিষয়ে কখনই মতামত প্রকাশ করতেন না।

তবে তাদের গঠনতান্ত্রিকভাবে সুশৃংখল সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার কারণে মিসরে সালাফী আন্দোলনের জন্য একটি উন্মুক্ত ময়দান সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও তাদের কার্যক্রম মূলতঃ আল্লাহ্র আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতাকেই নির্দেশ করে। সংগঠনের সাইনবোর্ডে তারা একাধারে সাংগঠনিক তৎপরতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সালাফী আন্দোলনের একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরী করেছে। যদিও মিসরীয় নিরাপত্তা বাহিনী তাদের তৎপরতার দিকে সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং তাদের নানা কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

সংগঠনটি 'আত-তাওহীদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করে। এর সক্রিয় কর্মী সংখ্যা ১০ হাযারের বেশী নয়। তবে জনকল্যাণমূলক ফাউণ্ডেশনসমূহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী এবং মসজিদসমূহের মাধ্যমে তাদের একটি শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে মিসরে। অবশ্য নব্বইয়ের দশক থেকে ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সরকারীভাবে তাদের কার্যক্রমে ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণারোপ করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ :

শায়খ মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফিকী, আব্দুর রাযযাক্ব আফীফী, আব্দুর রহমান ওয়াকীল, রাশাদ শাফেঈ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বর্তমানে ড. জামাল এবং ড. আব্দুল আযীম এই সংগঠনের কর্ণধার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

দ্বিতীয়তঃ স্বল্প প্রসিদ্ধ সালাফী গ্রুপসমূহ

১. সালাফিইয়াহ মাদ্খালিইয়াহ :

১৪১১/১৪১২ হিজরীতে সঊদী আরবের মদীনায় এই সালাফী গ্রুপটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদা বিভাগের অধ্যাপক প্রয়াত মুহাম্মাদ আমান জামী এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের অধ্যাপক শায়খ রবী বিন হাদী আল-মাদখালী এর হাল ধরেন। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত এ গ্রুপটিরই একটি শাখা মিসরে ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় জন্মলাভ করে। মূলতঃ ইরাক-কুয়েত যুদ্ধে ওলামাদের অবস্থানকে কেন্দ্র করেই এর জন্ম। এ গ্রুপটি একদিকে সে সময় কুয়েতে বিদেশী সৈন্য অনুপ্রবেশবিরোধী ওলামাদের ফৎওয়া সমর্থন করেনি, আবার সঊদী 'হায়আতু কিবারিল ওলামা'র ফৎওয়াও সমর্থন করেনি–যারা বলেছিলেন, প্রয়োজনে বিদেশী শক্তির সহযোগিতা নেয়া যাবে। বরং উভয়মতের সংমিশ্রণে তারা মধ্যবর্তী এমন একটি মত প্রকাশ করেছিল, যা একদিকে বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশকে নির্বিচারে বৈধতা দেয় না আবার পুরোপুরি হারামও করে না।

সংগঠনটির আক্বীদা ও কার্যক্রম :

অন্যান্য সালাফী সংগঠনের মত এই সংগঠনটিও মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা বৈধ মনে করে না, যদিও তিনি ফাসিক হন। তবে তারা এই নীতিতে একটু বেশীই কট্টর। সংগঠনটি মনে করে, সরকারের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ বৈধ তো নয়ই, এমনকি সরকারকে প্রকাশ্যে নছীহত করাও জায়েয নয়। এই নীতিকে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি মনে করে এবং এর বিরোধিতাকে মুসলিম শাসকের বায়'আত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার শামিল মনে করেন। মাদখালীরা আরো মনে করেন, শুধু সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাই যথেষ্ট নয়; বরং সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকেই সমানভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, যেমন–দারুল ইফতা। তাদের মতে, রাষ্ট্র নিযুক্ত আলেমগণের ফৎওয়ার বিরোধিতা করাও কারো উচিৎ নয়। এমনকি যদি ওলামারা সম্মিলিত সিদ্ধান্তে ব্যাংকের সূদকে হালাল ঘোষণা করেন তবুও সে ফৎওয়াকেই স্বীকৃতি দিতে হবে। এর কোন ব্যত্যয় করা চলবে না। যদি কেউ বিরোধিতা করে তবে সে 'খারেজী'দের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

অন্যান্য সালাফী সংগঠন থেকে কিছুটা ভিন্ন পথে হেটে তারা মনে করে, রাষ্ট্র এবং শাসকের সমন্বয়েই একটি মুসলিম জামা'আত। তাই রাষ্ট্র ও শাসক ব্যতিরিকে ভিন্ন কোন ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ইসলামী আদর্শ বিরোধী। একে তারা 'হিযবিয়্যাহ' বা ফির্কাবন্দী বলে মনে করে। কেননা এসব সংগঠন মুসলিম জামা'আতের ঐক্যবদ্ধ চেতনার বিরোধী। ফলে এসব সংগঠন পরিচালনাকারীরা তাদের দৃষ্টিতে 'খারেজী' এবং দ্বীনের মাঝে নব্যসৃষ্টিকারী মুবতাদি'। তাদের দাবী, অন্যান্য ইসলামী দলসমূহের বিরুদ্ধে তাদের এই আক্রমাণত্মক মূলনীতির লক্ষ্য হল–উম্মতের মধ্যে ফের্কাবন্দীর অবসান ঘটানো এবং উম্মাহকে একক শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা।

উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ :

মাহমূদ লুত্বফী আমের, উসামা আল-ক্বাওছী, মুহাম্মাদ সাঈদ রাসলান প্রমুখ।

২. আদ-দা'ওয়াতুস সালাফিইয়াহ :

মিসরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের একদল নেতা সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সালাফী আন্দোলনের একটি ইলমী ধারার কার্যক্রম শুরু করেন। মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক এ আন্দোলনের পরিচালনা কেন্দ্র ছিল আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। মুহাম্মাদ ইসমাঈল, সাঈদ আব্দুল আযীম, আবূ ইদরীস, আহমাদ

ফরীদ প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ এখান থেকেই মিসরের সর্বত্র এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিতেন। কায়রোতে এই সংগঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন আব্দুল ফাত্তাহ যায়নী। ১৯৭৮ সালে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আন্দোলনের অনুসারী ছাত্ররা ইখ্ওয়ানুল মুসলিমীনের সাথে সম্পৃক্ত হতে অস্বীকার করে একটি পৃথক সালাফী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যার নামকরণ করা হয় 'মাদরাসা সালাফিইয়াহ'। এ সংগঠনের কর্ণধারগণ দলীয় প্রধানের পদবী হিসাবে 'আমীর' শব্দটি ব্যবহার করতেন না। কারণ তাদের মতে, এ শব্দটি শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় আমীরের জন্য প্রযোজ্য। এর পরিবর্তে তারা দলীয় প্রধান আবূ ইদরীসকে 'ক্বাইয়িমুল মাদরাসা আস-সালাফিইয়াহ' লকব দিয়েছিলেন।

বেশ কয়েক বছর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা মিসরে এ সংগঠনের প্রচারণা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অনুসারীদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা তাদের সংগঠনের নাম রাখেন 'আদ-দা'ওয়াতুস সালাফিইয়াহ'।

সংগঠনের আক্বীদা ও কার্যক্রম :

ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনের বুঝ অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দুই মৌলিক উৎস থেকে তারা ইসলামের মর্মবাণী গ্রহণ করতে চান। তারা তাওহীদ প্রসঙ্গ, আক্বীদা শুদ্ধিকরণ এবং যাবতীয় শিরক-বিদ'আতকে সর্বতোভাবে বর্জনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখেন। আর এই মানহাজকে যারা অনুসরণ করেন তাদের সবাইকে তারা দ্বীনী জ্ঞানচর্চাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের আহ্বান জানান। কেননা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই কেবল শরী'আতের ফরয, সুন্নাত এবং ওয়াজিব সম্পর্কে বর্ণিত আদেশ-নিষেধসমূহ জানা সম্ভব। জ্ঞানচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কারণে তাদেরকে 'আস-সালাফিইয়া আল-ইলমিইয়াহ'ও বলা হয়।

এই সংগঠনটি মৌলিকভাবে তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত :

১. তাওহীদ : অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে একক মেনে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে এবং শিরককে অত্যাবশ্যকভাবে বর্জন করতে হবে।

২. ইত্তেবা : অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-কেই একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি যা আনয়ন করেছেন তার সাথে কোনরূপ সংযোজন-বিয়োজন করা যাবে না। তাঁর অনুসরণের অর্থ হল– 'রাসূল (ছাঃ)-এর পর যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকে যার কথা ও কর্ম অনুসরণযোগ্য–তিনি হলেন রাসূল (ছাঃ)'।

৩. তাযকিয়াঃ অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান মোতাবেক আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে, অন্য কারো আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে নয়।

উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ :

মুহাম্মাদ ইসমাঈল, আহমাদ ফরীদ, সাঈদ আব্দুল আযীম, মুহাম্মাদ আব্দুল ফাত্তাহ, ইয়াসের বারহামী, আহমাদ হুত্বায়বাহ, ইমাদুদ্দীন আব্দুল গফুর প্রমুখ।

৩. সালাফিইয়াহ হারাকিইয়াহ :

আলেকজান্দ্রিয়াতে 'দা'ওয়াহ সালাফিইয়াহ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় কায়রোর 'শুবরা' এলাকায় কয়েকজন যুবক 'সালাফিইয়াহ হারাকিইয়াহ' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– শায়খ ফাউযী সাঈদ, শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল মাক্বছূদ প্রমুখ।

সংগঠনের আক্বীদা ও কার্যক্রম :

দাও'য়াহ সালাফিয়াহ্‌র মানহাজ অনুসরণ করার সাথে সাথে তারা মুসলিম সমাজে নারীদের পর্দাহীনতা এবং অনুরূপ সকল পাপাচারকে জাহেলী কর্মকাণ্ড মনে করতেন এবং এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাদের মতে, জামা'আতবদ্ধভাবে বা দল গঠন করে দাওয়াতী কাজ করা যাবে; তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে, ফির্কাবন্দী করা যাবে না এবং আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য ছাড়া নির্দিষ্টভাবে কোন চিন্তাধারার উপর গোঁড়ামি করা যাবে না। অর্থাৎ কোন একটি দলকে কেন্দ্র করে কারো সাথে বন্ধুত্ব করা বা শত্রুতা রাখা নিষিদ্ধ। এছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত কোন ইসলামী দল ও গোষ্ঠীকে জাহান্নামী ৭২ ফেরকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ :

মুহাম্মাদ আব্দুল মাক্বছূদ, সাইয়েদ আরাবী, শায়খ ফাউযী, শায়খ নাশ'আত ইবরাহীম প্রমুখ।

ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সালাফী গ্রুপসমূহ

মিসরে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো কোন সংগঠনের সাথে জড়িত নয় বা সাংগঠনিকভাবে কার্যক্রমের কোন প্রচেষ্টাও তাদের নেই। সাধারণতঃ একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সমবেত কিছু ছাত্রকে নিয়ে এসকল মাজমা' গড়ে উঠে। শিক্ষকদের প্রসিদ্ধি ও দাওয়াতী তৎপরতার উপর ভিত্তি করে এ সকল মাজমা'র আকার ছোট-বড় হয়ে থাকে।

তাদের আক্বীদা ও কার্যক্রম :

তারা প্রথমতঃ মানুষের মৌলিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী *(রা'দ ১১)*। তাদের মতে, মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান দশা কস্মিনকালেও পরিবর্তন সম্ভব নয়, যতক্ষণ না প্রতিটি ব্যক্তি ইসলামের বিশুদ্ধ মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেকে সংশোধন করে। প্রথমে ব্যক্তি নিজের অবস্থা সংশোধন করবে। অতঃপর আশেপাশের লোকদেরকে সংশোধন করবে। যেমন–তার নিজ পরিবার, সমাজ, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তারাও নিজেদের সংশোধন করে তাদের পরিবার, সমাজ ও বন্ধু-বান্ধবকে সংশোধন করবে। এভাবে গোটা জাতির পরিবর্তন সম্ভব। তারা অন্যান্য সালাফী গোষ্ঠীর মতই দ্বীনকে শিরক-বিদ'আত মুক্ত করতে চান। অধুনা তারা তাদের আক্বীদা প্রচারে আধুনিক নানা মিডিয়া ব্যবহার করছেন। তবে রাজনীতির সাথে তারা জড়াতে আগ্রহী নন এবং এ বিষয়ে তারা প্রকাশ্যে কোন কথাও বলেন না।

উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ :

আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উছূলে ফিকহ বিভাগের শিক্ষক উসামা আব্দুল আযীম, শায়খ মুহাম্মাদ হুসাইন ইয়াকুব, শায়খ আবূ ইসহাক্ব হুওয়াইনী, শায়খ মুছত্বফা আদাভী প্রমুখ।

সাম্প্রতিক বিপ্লবে সালাফীদের তৎপরতা

তাহরীর স্কয়ারকে মিসরীয় বিপ্লবের প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। বিপ্লবের দিনগুলোতে তাহরীর স্কয়ারেই ছিল সারাবিশ্বের চোখ। এই স্থানে বিপুল পরিমাণ লোক সমাগম সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ময়দানে বিক্ষোভকারীদের অবস্থান ছিল দুই ভাবে দৃশ্যমান–

১. দলে দলে বিপুলসংখ্যক মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ময়দানে নামা : এই বিক্ষোভ মিছিলই মিসরে সরকার পতনে মূল ভূমিকা রেখেছিল। কোন কোন মিছিলে কয়েক মিলিয়ন মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ময়দানে উপস্থিতিদের বেশীরভাগই স্বেচ্ছাসেবী এবং অরাজনৈতিক। তারা যুলম-অত্যাচার, দরিদ্রতা ইত্যাদির তাড়নায় বিক্ষুব্ধ হয়ে মাঠে নামে।

২. বিক্ষোভের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে নেতৃত্ব প্রদানকারী রাজনৈতিক দলসমূহ : অর্থাৎ যারা এই বিক্ষোভ পরিচালনাকারী দলসমূহ। এই বিক্ষোভের অগ্নি প্রজ্জ্বলনে মিশরের রাজনৈতিক দলগুলিরই প্রধান ভূমিকা ছিল। বিশেষতঃ ময়দানে ইখওয়ান তথা ব্রাদারহুডের উপস্থিতিই ছিল সর্বাধিক চোখে পড়ার মত। বিক্ষোভকারীদের ৬০% থেকে ৭০% ভাগই ছিল এই সংগঠনের। আর সালাফীদের উপস্থিতি ছিল ১০% থেকে ২০%। বাক্বীরা ছিল খালেদ সাঈদ গ্রুপ, কিফায়াহ গ্রুপ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের

সদস্যগণ। বিক্ষোভে ইখওয়ানীরা অবশ্য সামনে থেকে নেতৃত্ব না দিয়ে পিছনে থেকে বিক্ষোভকারীদের সবরকম সহযোগিতা করে যাচ্ছিল। শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল মাকুছূদ বা শায়খ নাশআত আহমাদ বা শায়খ ফাওযী সাঈদের নেতৃত্বাধীন সালাফীরাও ময়দানে নামে। বিক্ষিপ্তভাবে আরো অনেক সালাফীকে ময়দানে নামতে দেখা যায়। এককথায়, ময়দানে সালাফীদের তৎপরতাও ছিল যথেষ্ট। টিভি চ্যানেলগুলোতে তাদের বড় ধরনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বিক্ষোভকালীন ধারণকৃত এমন একটি ভিডিও ক্লিপও পাওয়া যাবে না, যেখানে অন্ততঃ একজন দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী পুরুষ বা একজন পর্দানশীন নেকাবধারী মহিলা নেই।

২৫শে জানুয়ারীর বিপ্লবে সালাফীদের ভূমিকা

১. বিপ্লব এবং বিপ্লবীদেরকে মদদ প্রদান : সালাফী দলগুলির মধ্যে কায়রোর সালাফী দলসমূহ ২৫শে জানুয়ারীর বিপ্লবের শুরু থেকেই বিক্ষোভকারীদেরকে সহযোগিতা করেছে। যাদেরকে আগে 'সালাফিয়াহ জিহাদিয়াহ' বলে আখ্যা দেওয়া হত। এদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ইতিপূর্বে বারবার গ্রেফতার ও হয়রানী করা হয়েছিল। তাই এই গোষ্ঠীগুলি বিপ্লবকে কেবল সহযোগিতাই করেনি; বরং তাদের অনেকেই সরাসরি মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে। ২৫শে জানুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিপ্লবের দিনগুলিতে শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল মাকুছূদ, শায়খ নাশআত আহমাদ, শায়খ ফাউযী সাঈদসহ মাদরাসার শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছে। এই গ্রুপের নেতারা যুবকদের উদ্দেশ্যে হোসনী মোবারকের অপশাসন থেকে মুক্তির জন্য বক্তব্য পেশ করেন, যা যুবকদেরকে বিপ্লবের বৈধতা সম্পর্কে সংশয় দূর করে তাদেরকে আরো উজ্জীবিত এবং শক্তিশালী করে তোলে।

কায়রোর বাইরে প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলিতে অন্যান্য সালাফী সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় এবং তারাও বিক্ষোভকারীদের সাথে একাত্ম হয়ে মোবারক সরকারের পতনের দাবী তোলে।

প্রখ্যাত দাঈ শায়খ মুহাম্মাদ হাস্‌সান বিপ্লব সমর্থক সালাফী দাঈদের কাতারে অন্যতম ছিলেন। বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখলেও শেষের দিকে নিজের সন্তানদেরকে নিয়ে বিপ্লবের কেন্দ্র তাহরীর স্কয়ারে এসে উপস্থিত হন এবং রক্তপাত, নির্যাতন বন্ধ করে হোসনী মোবারককে গদি ছাড়ার আহ্বান জানান। এরপর ড. নাছর ফরীদ, ড. আলী সালূস, ড. আব্দুস সাত্তারসহ আযহারের আরো অনেক সালাফী নেতা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন। তারা বিক্ষোভকারীদেরকে সহযোগিতা করেন এবং তাদের ভূমিকাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন। তবে তারা বিপ্লবীদেরকে ভাঙচুর ইত্যাদি অপরাধ না করা আহ্বান জানান।

২. **বিপ্লবের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ :** ২৫শে জানুয়ারীর বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিলেন যারা, তাদের মধ্যে শায়খ মাহমূদ মিছরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিপ্লবীদের ময়দান ছেড়ে ঘরে ফেরার আহ্বান জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেই ময়দান ছাড়তে হয় এবং বিপ্লবীরা তাকে আর এ বিষয়ে নছীহত করারও সুযোগ দেয়নি। ইতিপূর্বে শায়খ মিছরী টেলিভিশনের পর্দায় দেশকে ফিৎনা-ফাসাদ থেকে রক্ষার্থে অবিলম্বে এই বিপ্লব-হাঙ্গামা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বিপ্লব বিরোধীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরেকজন হচ্ছেন, শায়খ মুছত্বফা আদাবী। তিনি মিশরীয় টিভি চ্যানেলে এই বিপ্লবের কঠোর বিরোধিতা করেন এবং যুবকদেরকে ঘরে ফেরার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এমন বিপ্লব দেশে ফেৎনা-ফাসাদ, খুন-রাহাজানি এবং মুসলিমদের মধ্যে আত্মঘাতি লড়াই ছাড়া কিছুই বয়ে আনবে না। তিনি আরো বলেন, মুসলমানদের পারস্পরিক এই লড়াইয়ে যদি কোন ব্যক্তি নিহত হয় তাকে শহীদ বলা যাবে না। এভাবে তিনি সাধ্যমত নিরুৎসাহিত করেন তাহরীর স্কয়ার দখলকারীদের।

আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন শায়খ মুহাম্মাদ হুসাইন ইয়াকুব। যিনি এই বিপ্লবকে একটি 'আত্মবিনাশী ফেৎনা' বলে আখ্যা দেন। তিনি যুবকদেরকে ঘরে ফেরার এবং ময়দানের পরিবর্তে মসজিদকে আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানান। তিনি বিপ্লবকে নিরুৎসাহিত করতে ফেৎনা-ফাসাদ সংক্রান্ত হাদীছসমূহের উদ্ধৃতি পেশ করে যুবকদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেন।

৩. নীরব ভূমিকা পালন : এক্ষেত্রে প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ আবূ ইসহাক্ব আল-হুওয়াইনীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর টেলিফোন-মোবাইল পর্যন্ত বন্ধ করে রাখেন। তাঁর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট থেকেও এ বিষয়ে কোন কিছু জানা যায়নি। এমনকি অদ্যাবধি তাঁর সুস্পষ্ট মতামত জানা সম্ভব হয়নি।

৪. অস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ : আলেকজান্দ্রিয়ার 'দাওয়াহ সালাফিইয়াহ' সংগঠনটির অবস্থান ছিল অস্পষ্ট। এই সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ড. ইয়াসির বারহামী প্রাথমিকভাবে এক প্রশ্নের উত্তরে ২৫শে জানুয়ারীর বিপ্লবের বৈধতা নাকচ করে ফৎওয়া প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'দ্বীনের পাবন্দী, দেশের কল্যাণে আমাদের দায়িত্বশীলতা, দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা এবং দেশে শত্রুদের ফেৎনা বিস্তারের সুযোগ বানচাল করার জন্য আমরা ২৫শে জানুয়ারীর বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী নই...'। ২৯শে জানুয়ারী এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'গতকালের মিছিল-মিটিংয়ে দেশ ও জনগণের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন ইত্যাদি হয়েছে, তা কারো অজানা নয়। কারাগারে বন্দী অপরাধীদেরকে মুক্ত করা, সরকারী অফিস-আদালত, জনগণের বাসা-বাড়ী ভাঙচুর করা কোনক্রমেই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না; বরং বিপ্লব দীর্ঘায়ু হলে এসব অপরাধকর্ম আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এসব অপরাধ ঠেকাতে প্রত্যেক মুসলিমকে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে'।

কিন্তু ৩১শে জানুয়ারী এবং ১লা ফেব্রুয়ারী এ সংগঠনের পক্ষ থেকে আরো দু'টি পৃথক বিবৃতি প্রদান করা হয়, যাতে তারা বিপ্লব পরবর্তী সরকারের প্রতি আগাম কয়েকটি দাবী উত্থাপন করেন। তাদের এ সকল দাবী থেকে স্পষ্টতই ফুটে উঠে যে, তারা বিপ্লবীদের দাবীসমূহের সাথে একমত। যেমন–জরুরী আইন অবশ্যই তুলে নিতে হবে। প্রত্যেকটি সরকারী পদে এবং মন্ত্রণালয়ে আল্লাহভীরু যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করতে হবে। দেশে চলমান বিশৃংখলাকে প্রতিরোধ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। তথ্য অধিদপ্তরকে সংস্কার করতে হবে। সরকারী নির্দেশে যেসব পুলিশ কর্তৃক অপরাধ এবং অবিচার ঘটেছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে ইত্যাদি।

শায়খ বারহামী তাদের এই বিপরীতমুখী অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরে বলেন, তারা জনগণের বৈধ দাবীকে সমর্থন করেন ঠিকই, তবে ফেৎনা-ফাসাদ এবং শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডকে বৈধ মনে করে না।

'দা'ওয়াহ সালাফিইয়া আলেকজান্দ্রিয়া' এই বিপ্লবকে তাদের ঘর গোছানোর কাজে ব্যবহার করে এবং এই সুযোগে তারা আলেকজান্দ্রিয়া, ত্বানত্বা, মানছূরা, কায়রোসহ অনেক জায়গায় সমাবেশের আয়োজন করে। তারা বিপ্লব পরবর্তী রাষ্ট্রীয় সংবিধান যেন ইসলামী শরী'আতভিত্তিক হয় সে ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার কাজ করেন। তাদের এই ভূমিকাই মূলত: মিসরের রাজনীতিতে সালাফীদের জন্য নতুন একটি অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যা ছিল ইতিপূর্বে ধারণার বাইরে।

বিপ্লবে সালাফীদের ভূমিকা মূল্যায়ন

সত্যি কথা বলতে মিশরীয় বিপ্লবে সালাফীদের প্রাথমিক ভূমিকায় এটা স্পষ্ট করে বলা কঠিন ছিল যে, তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে। যেমন–একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে তারা কি দেশের ক্ষমতা পেতে চায়? আর এর জন্য তারা কোন নীতিই বা মেনে চলবে? নাকি সরকারে অংশগ্রহণ না করে বাহির থেকে কেবল সরকারের উপর চাপসৃষ্টিকারী প্রেসার গ্রুপ হিসাবেই তারা সন্তুষ্ট থাকবে?

এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, কোন কোন সালাফী সংগঠন এই বিপ্লবের বাস্তবতাই পরিমাপ করতে পারেনি, পারেনি এর আভ্যন্তরীণ শক্তির বিপুলতা অনুমান করতে। সেজন্য বলা যায়, ইখ্ওয়ানীরাই ছিল প্রকৃতঅর্থে এই বিপ্লবের সক্রিয় শক্তি এবং বিপ্লবে তাদের গড় অংশগ্রহণ ছিল শতকরা ৭০ ভাগ। আর সেকারণেই সরকার তাদেরকে মতবিনিময়ের জন্য আহ্বান করেছিল। যদিও ইখওয়ানীরা এ দায়িত্ব না নিলেও 'দাওয়াহ সালাফিয়াহ' দলটির পক্ষে ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের দাবী নিয়েই বিক্ষোভকারীদের পরিচালনা করার সুযোগ ছিল। কেননা এ বিপ্লব চূড়ান্ত অর্থে এমনই একটি জাতীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল যে, সেখানে ইসলামীপন্থী, সেক্যুলার বা অন্য মতাদর্শের সকলেই সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কারো মাঝে কোন ভেদাভেদ ছিল না।

অন্যদিকে এই অস্পষ্টতার সাথে সালাফীদের কিছুটা স্ববিরোধীতাও যুক্ত হয়েছিল। শায়খ ইয়াসির বারহামী স্পষ্ট করেই বলেন যে, সালাফী পণ্ডিত শায়খ হাযেম ছলাহ আবু ইসমাঈলের পক্ষ থেকে বিপ্লবী যুবকদের উদ্যমী ও সাহসী ভূমিকার প্রশংসা ছিল মূলত: বাস্তবে ঘটে যাওয়া এক অসাধারণ বিপ্লবের স্তুতিগান। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাদের বিক্ষোভ মিছিল-মিটিংকে সমর্থন করেছেন।

একই দ্বিচারিতা দেখা যায় বিপ্লবের পরও। এ সময় সালাফীরা অনেক ক্ষেত্রে অনড় অবস্থান থেকে সরে এসেছে। যেমন– তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, যা ছিল সম্পূর্ণভাবে তাদের নীতিবিরোধী। তাদের সাম্প্রতিক অবস্থান যেন এটাই ইঙ্গিত করছে যে, তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের সার্বভৌমত্বকে যেন পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছে এবং শরী'আতের পরিবর্তে জনগণের ইচ্ছাকেই সংবিধানের ভিত্তি হওয়ার বিষয়টি অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও মেনে নিয়েছে। ফলে বিষয়টি এমনই দাড়াচ্ছে যে, খিলাফতের পরিবর্তে গণতন্ত্রই হতে যাচ্ছে আগামী সংবিধানের ভিত্তি। সালাফীরা তাদের এই স্ববিরোধী অবস্থানকে কিভাবে আগামীতে মোকাবিলা করবেন সেটাই দেখার বিষয়।

পরিশিষ্ট :

মিসরের জাতীয় নির্বাচন ও সালাফীদের অবস্থান

২০১১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী মোবারক সরকারের পতনের ৮ মাস পর অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩ দফায়। গত বছর ২৮-২৯শে নভেম্বর'১১ ১ম দফা ভোট গ্রহণের পর ১৪-১৫ ডিসেম্বর'১১ ২য় দফা এবং ৩-৪ জানুয়ারী'১২ ৩য় দফা ভোট গ্রহণ করা হয়। এই নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব সকল হিসাব-নিকাশ যে উল্টে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। নির্বাচনে ৬৫% ভোট পেয়েছে ইসলামপন্থীরা, যা সত্যিই সকল পূর্বানুমান ছাড়িয়ে গেছে। ফলে মিসরের শাসনক্ষমতা যে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ইসলামপন্থীদের হাতেই যাচ্ছে তা সুনিশ্চিত। পার্লামেন্টের মোট ৫০৮টি সীটের মধ্যে জনগণ নির্বাচিত ৪৯৮টি সীটে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' সমর্থিত ২২ দলীয় গণতান্ত্রিক ব্লক 'ফ্রীডম এণ্ড জাস্টিস' পার্টি জয়লাভ করেছে সর্বাধিক ২৩৫টি সীটে (৩৭.৫%)। আল-বাদাভী নেতৃত্বাধীন সেক্যুলার ব্লক 'নিউ ওয়াফ্দ' পার্টি এবং আহমাদ হাসান সাঈদ নেতৃত্বাধীন ইজিপশিয়ান ব্লক লাভ করেছে যথাক্রমে ৩৮টি (৯.২%) ও ৩৫টি (৮.৯%) সীট। অন্যদিকে 'দাওয়াহ সালাফিয়াহ' সমর্থিত ১৬ দলীয় ইসলামী ব্লক 'হিযবুন নূর' পার্টি জয়লাভ করেছে ১২৩টি সীটে। প্রথমবারের মত রাজনৈতিক পার্টি গঠন করেই সালাফীরা সর্বমোট ভোটের ২৭.৮ শতাংশ (৭৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৬৬টি ভোট) তথা এক-চতুর্থাংশেরও বেশী ভোট লাভ করেছে, যা ছিল একেবারে অচিন্তনীয়। সম্মিলিত ইসলামিক ব্লকের ১২৩টি সীটের মধ্যে সালাফী দল 'হিযবুন নূর' এককভাবেই লাভ করেছে ১১১টি সীট এবং পরবর্তীতে ১৮০ সদস্য বিশিষ্ট শূরা কাউন্সিলেও তারা পেয়েছে ৪৫টি সীট।

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে, যারা মিসরের নতুন সংবিধান রচনা করবেন। রচনা সম্পন্ন হবার পর এই সংবিধানের উপর একটি গণভোট আয়োজিত হবে। অতঃপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া পুরোপুরি সম্পন্ন হবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে ৩০শে জুন ২০১২ পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, গত ২৪শে মার্চ 'হিযবুন নূর' শায়খ হাযেম ছলাহ আবু ইসমাঈলকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করেছে। শায়খ আবু ইসহাক আল-হুয়ায়নীসহ অন্যান্য সালাফী আলেমগণ এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন।

হিযবুন নূর পার্টির পরিচয় :

মিসরীয় বিপ্লবের পর মিসরে হঠাৎ দৃশ্যপটে আবির্ভূত হওয়া সালাফী সংগঠন 'দাওয়াহ সালাফিয়াহ' বা 'দাওয়াহ মুভমেন্ট' তাদের রাজনৈতিক ফ্রন্ট হিসাবে 'হিযবুন নূর' পার্টি গঠন করে ২০১১ সালের ১২ই মে। পবিত্র কুরআনে স্বীয় কওমকে লক্ষ্য করে শু'আইব (আঃ)-এর উদ্ধৃত বক্তব্য তথা إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ (অর্থাৎ আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই–হূদ ৮৮)–এ আয়াতটিকে মূলনীতি করে 'হিযবুন নূর' তাদের শ্লোগান নির্ধারণ করেছে 'هوية ودولة عصرية' অর্থাৎ 'আত্মপরিচয় ও আধুনিক রাষ্ট্র'। পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে ইমাদুদ্দীন আব্দুল গফুর এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন সাইয়েদ মুছত্বফা, যিনি বর্তমানে পার্টির সংসদীয় দলের প্রধান।

অতীতে মিসরের সালাফীরা রাজনীতিতে জড়াতে কোন আগ্রহ দেখাননি। কেননা তারা বিশ্বাস করতেন, যে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি ভুয়া এবং অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থা। এজন্য মিসরীয় বিপ্লবের শুরুতে তাঁরা প্রথমে নিশ্চুপ এবং পরে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু মিসরীয় বিপ্লব শুরু হলে তারা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লবের সমর্থনে রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়েছিলেন, যদিও সরকারবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলকে তারা সমর্থন করেননি। তারা ধারণা করেছিলেন, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানো মূলত আমেরিকারই কারসাজি। এর মাধ্যমে তারা সরকারকে দিয়ে মিসরীয় জনগণের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তাদেরকে বিভক্ত করতে চায়।

কিন্তু বিপ্লবের পর তাদের আগের অবস্থান একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তারা মিসরের পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী পরিচিতিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে নতুন একটি দল হিসাবে 'হিযবুন নূর' নির্বাচনে যে সফলতা পেয়েছে তা তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা এবং মিসরীয় সমাজে সালাফীদের গ্রহণযোগ্যতারই পরিচায়ক। ৩০শে মে'১১ নির্বাচনী ইশতিহার প্রকাশ করা হয়। ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪২ পৃষ্ঠার ইশতিহারে তারা উল্লেখ করেছিলেন, 'হিযবুন নূর' রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃংখলা দূরীকরণ ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তাকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেবে। তারা আরও ঘোষণা করেন যে, তারা নির্বাচিত হলে মিসরকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। দেশের অধিকাংশ জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস অনুসারে মিসরের পরিচিতি হবে ইসলামী এবং আরব দেশ হিসাবে। মিসরের সরকারী

ভাষা হবে আরবী, রাষ্ট্রধর্ম হবে ইসলাম, ইসলামী শরী'আত হবে আইন রচনার ভিত্তি। দেশের সংবিধান যেভাবেই রচিত হোক না কেন, এই মৌলিক বিষয়গুলোকে সর্বাবস্থায় সংবিধানের উর্ধ্বে বিবেচনা করা হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সূদী লেনদেন উচ্ছেদ করা হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বত্র ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হবে ইত্যাদি।

তবে সালাফীদের ভোট পাওয়ার পিছনে এসব অঙ্গীকারের তেমন ভূমিকা ছিল না। কেননা ইখওয়ানের প্রতিশ্রুতিও কম-বেশী অনুরূপই ছিল, এমনকি মোবারক সরকারের সংবিধানেও প্রায় হুবহু ধারা সন্নিবেশিত ছিল। তাই সালাফীদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির চেয়ে তাদের বাহ্যিক অনাড়ম্বরতা, শরী'আতের পাবন্দী এবং উদার মানসিকতা তাদের বিজয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। তাদের ব্যাপকভিত্তিক দাতব্য কার্যক্রমও তাদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, তারা ভোট পেয়েছেন সাধারণত: সেসব নতুন ভোটারের, যারা কট্টর ইসলামপন্থী কিন্তু ইখওয়ানীদের সংকীর্ণ দলকেন্দ্রিক মানসিকতা, অনুদারতা এবং স্বার্থবাদী ধ্যান ধারণার কারণে তাদের উপর অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ।

সমালোচনা :

যত মহৎ লক্ষ্যেই সালাফীগণ রাজনীতির ময়দানে পদার্পণ করুন না কেন, তাদের এই নীতি পরিবর্তনকে সাধারণ সালাফীপন্থীদের অনেকেই সুদৃষ্টিতে নেননি। দীর্ঘকাল যাবৎ দ্বীনের ব্যাপারে যে আপোষহীন ভাবমূর্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল সালাফী আন্দোলন, তার এই আপোষমুখী ছন্দপতন অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যার প্রমাণ মিলেছে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটেই। বেশকিছু সমালোচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে তারা তাদের বর্তমান অবস্থান ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে এভাবে–

১. আপনারা ইতিপূর্বে প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে পাপাচার বলে এসেছেন, কিন্তু এখন আপনারা নিজেরাই সর্বশক্তি নিয়ে রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন–এটা কেন?

উত্তর : রাজনীতি হল জ্ঞানের অনুশীলন ও তার কার্যকরী প্রয়োগ, একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপালন ও তা বাস্তবায়নের প্রয়াস। জ্ঞান ও তত্ত্বগতভাবে ইতিপূর্বেও আমরা যেমন রাসূল (ছাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত সর্বশ্রেষ্ঠ নীতির (শরঈ রাজনীতি) অনুসরণ করে এসেছি, আজও করে যাচ্ছি। পরিস্থিতি বিবেচনায় সমাজের সার্বিক কল্যাণ বা সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে ইজতিহাদের সুযোগ সর্বাবস্থায় রয়েছে। পূর্ববর্তী শাসনামলে যে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তাতে শান্তি পূর্ণভাবে শরঈ নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষমতা আমাদের ছিল না। কেননা তৎকালীন সময়ে সরকার সুযোগ পেলে কেবল বিরোধীদের গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হত না; বরং শরঈ আইনের কোন একটি তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে তা নিমিষেই পরিত্যাগ করার মত বেপরোয়া ছিল। এর প্রমাণ ভুরি ভুরি। সাথে সাথে অপসারিত প্রেসিডেন্ট স্বৈরতান্ত্রিকভাবে কলমের জোরে পার্লামেন্ট চালাতেন। তাই তৎকালীন রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে আমরা বৈধ মনে করিনি।

২. জাতীয় সংসদসমূহ অনেকের দৃষ্টিতে কুফরী সংসদ কেননা তা শরী'আত অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। বর্তমানে এমন কি সংস্কার এসেছে যে আপনাদের অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে গেল?

উত্তর : মোবারক সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালের সংবিধানে যে নতুন সংশোধনী আনা হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল ইসলামী শরী'আতবিরোধী সমস্ত আইন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। এই আইন অনুমোদনের পর ইজতিহাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মিসরের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আর অবৈধ নয়। কিন্তু তৎকালীন ন্যাশনালিস্ট পার্টির একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চার কারণে অন্য কোন দলের পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিরর্থক হয়ে পড়ে। ফলে আমরা সে সময় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিনি।

প্রশ্ন : উদারপন্থীদের সাথে 'হিযবুন নূর'-এর যে জোট বাধার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়ে 'হিযবুন নূর'-এর বক্তব্য কী?

উত্তর : এর উত্তরে 'দাওয়াহ সালাফিয়াহ' নেতা ড. ইয়াসের বারহামী তাঁর নিজস্ব ওয়েবসাইট 'ছওতুস সালাফ'-এ বলেন, শরী'আতবিরোধী মতাদর্শের কোন দলের সাথে জোট বাধার বিষয়টিতে আমি সাধারণভাবে বলব, এটা জায়েয নয়। তবে আল্লাহ্‌র মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে প্রয়োজনে জোট বাধা যেতে পারে। তবে এটা হতে হবে কেবলমাত্র হক্বকে বিজয়ী করার স্বার্থে। প্রচলিতঅর্থে যদি বিষয়টি হক্ব-বাতিল যাই হোক সকল ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে পরস্পরের সহযোগী হবে–এমনটি হয়, তবে তা কখনই জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে ঐ সকল মৈত্রীতাও জায়েয নয়, যা তথাকথিত কেকের মত বিভক্তিকে সমর্থন করে। অর্থাৎ উদারপন্থীরা তাদের মত উদারপন্থার প্রচার করবে, গণতন্ত্রীরা গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে আইন রচনার ভার তুলে দিবে, আবার ইসলামপন্থীরা নিজ অবস্থানে থেকে নিজেদের মত ইসলাম প্রচার করে যাবে–এ ধরণের জোট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এতে 'হিলফুল ফুযূল'-এর মত হক্বকে বিজয়ী করা বা মযলূমের অধিকার সংরক্ষণের কোন স্বার্থ নেই। এটা একটা ভ্রান্ত ক্বিয়াস।

শেষকথা

এটা সত্য যে, মিসরের নির্বাচনে সালাফীদের বিজয় একটা বড় ঘটনা এবং মিসরে তাদের জনসমর্থনও যে কতটা তুঙ্গে তার একটা অভাবনীয় চিত্র ফুটে উঠেছে এ নির্বাচনে। বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে সালাফীরা কেবলমাত্র একটি তাত্ত্বিক গোষ্ঠী নয়; বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা রাখার মত গভীর আন্দোলনী শক্তি তাদের মাঝে সমভাবে বর্তমান। বিশ্ব মিডিয়াতেও তারা বড় ধরনের ইতিবাচক-নেতিবাচক কাভারেজ পেয়েছেন। ফলে হঠাৎ করেই দৃশ্যপটে এসে যথেষ্ট সমীহ অর্জন করতে পেরেছে মিসরের সালাফীরা। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে যে বিষয়টি আপাতত আড়ালে পড়ে গেছে তা হল, এ নির্বাচনে সালাফীদের জয় হয়েছে বটে, কিন্তু তারা খুইয়েছে অনেক কিছুই। আপাতত যত যুক্তি এবং মহৎ উদ্দেশ্যের কথাই বলা হোক না কেন, প্রকৃতঅর্থে এতে সালাফীদের নৈতিক পরাজয়ই ঘটেছে। কেননা যে আদর্শের জন্য সালাফীদের আপোষহীন সংগ্রাম, যে সুন্নাতে নববীকে সুরক্ষা দানের জন্য তাদের সুখ্যাতি, যে খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের শাশ্বত প্রতিজ্ঞা–এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেই প্রতিজ্ঞার শুভ্র পরিচ্ছদে কি বড় এক কালো ছোপ রেখাপাত করল না? এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মিসরে সালাফীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং বিপুল বিজয় অর্জনে সালাফীপন্থীদের প্রকৃতঅর্থে খুশী হওয়ার মত কিছু ঘটেনি। কেননা যে বিজয়ের জন্য তাদেরকে দীর্ঘদিনের লালিত আদর্শকে বিকিয়ে দিতে হয়েছে, যে আদর্শের লড়াইয়ে নেমে তাদেরকে আপন ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করতে হয়েছে, তাতে গর্বের কিছু নেই বরং তা নিতান্তই লাঞ্ছনার। ইতিমধ্যেই ইরান সম্পর্কে তারা যে আপোষমুখী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের আপোষকামিতার যে সকল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠছে, তাতে একটি কট্টর আদর্শিক আন্দোলনের পথ থেকে পিছু হটে প্রচলিত স্বার্থবাদী আদর্শহীন গণতান্ত্রিক দলে পরিণত হতে তাদের খুব বেশি সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে না। আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন এবং সকল প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থ ও লোভ-লালসা থেকে হেফাযত করুন। এ মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নিকট কায়মনোবাক্যে আমরা এই দো'আই করতে পারি–'হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না, আমাদেরকে হেদায়াত দানের পর এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহান দাতা *(আলে ঈমরান ৮)*।

লেখক : মাস্টার্স অধ্যয়নরত (উছূলুদ্দীন), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোর মিছিলে খ্যাতনামা বৃটিশ সাংবাদিক রিডলে

[ইভোন রিডলে (Yvonne Ridley) একজন বৃটিশ মহিলা সাংবাদিক। ১৯৫৮ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের ডারহামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে নেন এবং সানডে টাইমস, ইণ্ডিপেন্ডেন্ট, দি অবজারভার, দি মিরর প্রভৃতি খ্যাতনামা পত্রিকায় কাজ করেন। তিনি 'সানডে এক্সপ্রেস'-এর প্রধান রিপোর্টার হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন ২০০১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার মাত্র কয়েকদিন আগে ছদ্মবেশে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন। কিন্তু তালেবানদের হাতে সাথে সাথেই তিনি বন্দি হন। তাঁর বন্দি হওয়ার ঘটনা এ সময় বিশ্ব মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়। পরবর্তীতে মুক্তিলাভের পর তিনি ইসলাম বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেন। অবশেষে ২০০৩ সালের গ্রীষ্মে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। পবিত্র কুরআনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তিনি একে আখ্যা দিয়েছিলেন নারীদের জন্য 'ম্যাগনাকার্টা' হিসাবে। বর্তমানে তিনি লণ্ডনভিত্তিক প্রেস টিভিতে কাজ করছেন এবং একজন শক্তিশালী মানবাধিকারকর্মী হিসাবে মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনা করছেন। ইসলাম গ্রহণের পর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন পত্রিকা, ওয়েবসাইট ও ব্লগ থেকে প্রাপ্ত তার বন্দিজীবন এবং ইসলাম গ্রহণের বিবরণভিত্তিক তিনটি সাক্ষাৎকার পাঠকদের জন্য এখানে তুলে ধরা হলো-নির্বাহী সম্পাদক]

দুঃসাহসী বৃটিশ মহিলা সাংবাদিক ইভোন রিডলের নামটি 'ওয়ার অন টেরর' বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি নাম। আফগানিস্তানের গগণচুম্বী পর্বতশৃঙ্গকে যিনি নত করেছিলেন তার দুঃসাহসিক মনোবল দ্বারা। জাদরেল পশ্চিমা সাংবাদিকরা যখন তালেবান-আলকায়েদার স্বর্গরাজ্য আফগানিস্তানের কথা ভেবে আতঙ্কে আঁতকে উঠত এবং নাইন ইলেভেনের পর মার্কিন রণহুঙ্কারের পাল্টা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাক-আফগান সীমান্ত জিহাদী আগ্নেয়গিরির সংকেত ঈষাণ কোনে জমাট বেঁধে উঠছিল তখন একজন মহিলা হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন র‍্যাডলি। কিন্তু ভাগ্যিস! তালেবানের অদক্ষ হাতেই ধরাশায়ী হলো বৃটিশ সাংবাদিকের নায়কসুলভ ও বীরত্বপূর্ণ সকল কৌশল। আফগান বোরকার মধ্যে তালেবানরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন, ভিন্ন জাত, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন চামড়ার এক রমণীকে। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অবশেষে তাঁর ঠাঁই হলো কারার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। পরে জানা গেল তিনি এক বিখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক। কিন্তু পরিস্থিতি তালেবানদের বাধ্য করল তাকে পর্যবেক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখতে। আসুন রিডলের মুখেই আমরা শুনি তাঁর গ্রেপ্তার, মুক্তি ও ইসলাম গ্রহণের কাহিনী।

মিসরে একান্ত সাক্ষাৎকারে রিডলে

২০০৬ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত (WAMY)-এর সম্মেলনে বিশেষ অতিথির আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হলে সাংবাদিক হাসুনা হাম্মাদ সম্মেলনের ফাঁকে তাঁর কাছ থেকে নিচের সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন : শুরুতেই আপনি কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করে ধন্য হলেন সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই।

রিডলে : আমি ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার আগে 'সানডে এক্সপ্রেস' পত্রিকার পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের ইসলামী দলগুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন তালেবানদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখ তালেবানের হাতে আমি বেআইনীভাবে আফগানিস্তানে প্রবেশ করার অভিযোগে গ্রেফতার হই। ১০ দিন আমি তাদের কাছে যিম্মী থাকি। প্রতিটি সময় আমি তাদের হাতে নিহত হওয়ার ভয়ে আতংকিত ছিলাম। ষষ্ঠ দিনে হঠাৎ তালেবানের এক শায়খ এসে আমাকে ইসলামে প্রবেশ করার দাওয়াত দিলেন। আমি বলে দিলাম এটা সম্ভব নয়। তবে তারা আমাকে মুক্তি দেয়ার শর্তে এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করি যে, লন্ডন ফিরে গেলে আমি কোরআন নিয়ে গবেষণা করব। আসলে এ প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল মুক্তির সুযোগ বের করা। কেননা, আমি যেকোনো উপায়ে এ সংকট থেকে বের হতে চাচ্ছিলাম। সত্যি বলতে কি, এ পথটি বা বলতে পারেন আমার এ কৌশলটি সফল হয়। অতঃপর তারা আমাকে এবং আমার সাথে অন্যান্যদেরও মুক্তি দিল। মোল্লা ওমর মানবিক কারণে আমাকে মুক্তি দেন। মুক্তিলাভের পর দেশে ফিরে আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমি আমার কমিটমেন্ট রক্ষা করবো। আমি কুরআন শিখতে লাগলাম এবং দীর্ঘ ৩০ মাস ইসলাম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করি। বাস্তবিকই তখন আমি অন্যরকম অনুভূতি অনুভব করছিলাম।

প্রশ্ন : তালেবানের হাতে বন্দী থাকাকালে আপনার সঙ্গে তাদের ব্যবহার কেমন ছিল?

রিডলে : আমি তাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করি। অনশন করি। আমি যতই তাদের সাথে কঠোর আচরণ করতে থাকি ততই তারা আমার সাথে নম্র ব্যবহার করতে থাকে। তারা আমাকে বলত, তুমি আমাদের বোন। আমাদের অতিথি। আমরা চাই তুমি খুব স্বাচ্ছন্দে এখানে থাক। আমি মনে মনে ভাবতাম যে, যদি আমি তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করি, তাহলে তারা আমার সাথে কঠোর ব্যবহারে উদ্যত হবে। বিদ্যুতের শক, ধর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা তারা আমাকে নির্যাতন করবে, আমেরিকা যা মুসলমানদের সাথে গোয়ান্তানামো এবং আবুগারীবের কারাগারে করে আসছে। কিন্তু আমি একজনকেও পেলাম না যে আমাকে হয়রানি করেছে কিংবা আমার দিকে খারাপ দৃষ্টি দিয়েছে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনি কি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন?

রিডলে : ইসলাম গ্রহণের পর আমাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। বৃটিশ সরকারী বাহিনী আমার ওপর নির্যাতন চালায় আমার ব্যক্তিগত কারণে নয়। শুধু কেবল ইসলামের কারণে। তবে আমি ব্লেয়ার সরকারের নিকট সম্মানিত ছিলাম। আমার কাছে এমন সব পত্র আসে যেখানে বলা হয়, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে কিংবা হিজাব পরিধান করবে সে যেন পাশ্চাত্য সমাজে নিজেকে সংঘাতের প্রথম কাতারে শামিল

করে নিল। আর বাস্তবিকই হিজাব পরিধানকারী মহিলারা এ ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার মুখোমুখী। দুঃখের বিষয়, অনেক আরব ও মুসলিম দেশেও একই অবস্থা।

প্রশ্ন : আপনি কি কুরআনের ভাষায় আরবী শেখার ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করেছেন?

রিডলে : আমি আরবীতে শুধু একটি শব্দই জানি। আর তা হলো, আল-হক্ব (সত্য) এবং এ শব্দটি আমি আমার কথাবার্তা ও আলোচনায় প্রায়ই উল্লেখ করে থাকি।

প্রশ্ন : আপনার পরিবারের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? বৃটিশ প্রশাসনের ন্যায়?

রিডলে : আমার দুই বোন। বড় বোন বিশ বছর ধরে এক মুসলিম পরিবারের প্রতিবেশী হওয়ায় তিনি আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদে বিচলিত হননি, স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার দ্বিতীয় বোন আমাকে বিদ্রূপ করে বলেছিল, এবার তুমি আত্মঘাতি হামলার কাজটিও সেরে ফেল। আর আমার আম্মাও বিচলিত হয়ে গীর্জায় আসা-যাওয়া বাড়িয়ে দিলেন। তিনি স্বভাবতই খুবই ধার্মিক। এ বিষয়টি ইসলামের কাছাকাছি। আর যখন আমি তাকে ইসলামের সুস্পষ্ট দাওয়াত দিলাম, তিনি বললেন, আমার বয়স ৭৯। এ অবস্থায় আমার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : আপনি এখন কোথায় কর্মরত আছেন?

রিডলে : ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি বিভিন্ন ইসলামী মিডিয়ায় ইংরেজী ভাষায় অনেক আলোচনা উপস্থাপনা করেছি। পাশ্চাত্য মিডিয়াতেও ইদানিং আমি লেখালেখি শুরু করেছি। আমার সর্বশেষ প্রবন্ধটি ছিল 'হিজাব' যেটি ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত হয়। অমুসলিম বন্ধুদের সাথেও আমার সুসম্পর্ক বজায় আছে। বর্তমানে আমি আল-জাযীরা ইংলিশ চ্যানেলে কর্মরত রয়েছি।

প্রশ্ন : মুক্তির পর আপনি যে ইসলাম নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন, তার মধ্যে প্রথম বই/গ্রন্থ কোনটি ছিল?

রিডলে : এটি ছিল শহীদ সাইয়েদ কুতুব রচিত 'মা'আলিমুন ফিত ত্বরীক'। এ কিতাবটি পড়ে আমি খুব প্রভাবিত হই। যারা এটা পড়েননি আমি তাদের সকলকে এটা পড়ার অনুরোধ করবো। বড় দুঃখের বিষয় আমি যখন মিসর গিয়েছিলাম তখন লাইব্রেরিতে এই বইগুলো পাইনি। উসামা বিন লাদেনের ওপর আমি নিজেই একটি বই রচনা করেছি। কারণ তিনি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তবে উদ্দেশ্য উসামা বিন লাদেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয়।

প্রশ্ন : ডেনমার্কের ঘটনার পর মুসলিম ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার কী মূল্যায়ন?

রিডলে : আমাদের শক্তি ঐক্যের মাঝে। যা আমরা পশ্চিমা পণ্য বয়কটের মাধ্যমে লক্ষ্য করেছি। অর্থনৈতিক বয়কট সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এ ক্ষেত্রে আমি যায়নবাদী ইহুদি রাষ্ট্রের সমর্থক সকল দেশের কোম্পানিগুলোর পণ্য বয়কট করা উচিত বলে মনে করি। আমি তো এটা কল্পনাও করতে পারিনি যে, মুসলমানরা কীভাবে কোকাকোলা পান করে। তারাতো কোকাকোলা নয়, ফিলিস্তিনী ভাইয়ের রক্ত পান করছে। অর্থনৈতিক বয়কট হল মতপ্রকাশের একটি শান্তিপূর্ণ উপায়।

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যের ইসলামভীতি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

রিডলে : আমি মনে করি, অন্যের সাথে সম্পর্ক ও কর্মপন্থা ঠিক করার আগে আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। বিশেষত মুসলিম সমাজে ঐসব লোকেরা যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে; মিসরের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ফারুক হোসনীর মত লোকেরা। আল্লাহ তার অন্তরকে রোগমুক্ত করুক। তার ক্ষমা চাওয়া উচিত। সে তো বুঝতে পারেনি তার এসব বক্তব্য পাশ্চাত্যের মুসলিম নারীদের কত ক্ষতি করেছে। বলুন আমরা শত্রুর মোকাবিলা কীভাবে করি? সমস্যা তো আমাদের ভিতর থেকেই।

প্রশ্ন : এমন কোন মুসলিম মহিলার নাম বলুন ইসলাম গ্রহণের পর যারা দ্বারা আপনি প্রভাবিত হয়েছেন?

রিডলে : অনেক মুসলিম আরব মহিলা দ্বারা; তবে বিশেষ করে যায়নাব আল-গাযালী (র.)-এর কথা উল্লেখ করব। তাঁর আত্মজীবনী আমাকে মুগ্ধ করেছে।

তুর্কী পত্রিকার সাক্ষাৎকারে র‍্যাডলি

প্রশ্ন : আপনি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন?

রিডলে : প্রেসিডেন্ট বুশ তালেবান সরকারকে বিশ্বের সর্প বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করি, আমি তালেবানদের হাতে বন্দি হয়েছি, মার্কিনীদের হাতে নয়। আমি তাদের বন্দিশালায় যেন মেহমানখানায় অবস্থান করছিলাম। আমি কিভাবে তালেবানদের কৃতজ্ঞতা আদায় করব! কোন ভাষা পাচ্ছি না। আমি নিশ্চিত, তালেবান সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। আমি তাই স্থির করে নিলাম, আমি তাদের ধর্ম অধ্যয়ন করব। আর এ অধ্যয়ন ও গবেষণাই আমাকে ইসলামের পথ দেখাল।

প্রশ্ন : আপনি তালেবান যোদ্ধাদের হাতে কিছু দিন বন্দি ছিলেন, তাদের ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কী?

রিডলে : সত্যিই তারা উত্তম মানুষ। ইউরোপে তো আমার অনেক মুসলিম বন্ধুরাও রয়েছেন। কিন্তু তারা আমাকে ঐভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি যেভাবে তালেবানরা পেরেছে। আমি ১০/১১ দিন এমন সব লোকের সাথে কাটিয়েছি যাদেরকে হিংস্র ও বর্বর বলে গালি দেয়া হতো; কিন্তু তারা তো কখনো সে রকম ছিল না। তাদের ভালোবাসা ও নিষ্ঠা আমার মাঝে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন : আপনার সাথে তাদের আচরণ কেমন ছিল?

রিডলেঃ তারা খুবই সম্মানজনক ও মানবিক ব্যবহার করেছে। যদি একে আবু গারীব বা গোয়ান্তানামোর সাথে তুলনা করেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, আমার বন্দিত্ব ছিল একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। আমি তাদেরকে কথা দিয়েছি, ইসলাম সম্পর্কে পড়ালেখা করব যদি তারা আমাকে মুক্তি দেয়। আমি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, বৃটিশ সরকার যাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করছে তারা বরং স্বাধীনতার যোদ্ধাই বটে; যারা নিজের দেশের জন্য মুক্তির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সিদ্ধান্ত কীভাবে গ্রহণ করলেন?

রিডলে : আমি দীর্ঘ ৩০ মাস ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করেছি। আমি বিশেষত কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রভাবিত হই। আমি বিশ্বাস করি, একটি নতুন দুনিয়া আমি আবিষ্কার করতে যাচ্ছি। আমি অনুভব করতে লাগলাম, একটি নতুন তাড়না আমাকে স্বীয় স্থানে স্থিতবস্থায় থাকার ব্যাপারে বাধা দিচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম, ঈমান আমার অন্তরকে প্রশান্ত করছে। মনে হচ্ছিল, আল্লাহ নিজেই আমার অন্তরে ইসলামের বীজ বপন করে চলেছেন এবং

আমাকে ঐ আধুনিক সভ্যতার পংকিলতা থেকে মুক্ত করছিলেন যেখানে আমি বেড়ে উঠেছি। আমার অন্তরে এক চমৎকার প্রশান্তি ও স্বস্তিবোধ-এর সূচনা হতে লাগল। এটা নিশ্চয়ই আল্লাহপ্রদত্ত। আর তখনই আমি মনে করলাম, ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণার সময় এসে গেছে। অমনি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলাম। আমি হয়ে পড়লাম তখন থেকে মুসলিম। আমি বিশ্বাস করি, একমাত্র আল্লাহ্ই আমাকে তার হেদায়াত দান করেছেন। আজ আমি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করছি। আসলে ঈমান হলো এ দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম অনুভূতি।

প্রশ্ন : আপনার কি আপনার নাম পরিবর্তন করেছেন, নামটি কি তা জানতে পারি ?

রিডলে : জি করেছি। তবে আমি এখন ঘোষণা করতে চাই না।

প্রশ্ন : কেন?

রিডলে : আমি মনে করি, এটা তার জন্য উপযুক্ত সময় নয়। যখন সময় হবে তখন অবশ্যই ঘোষণা করব। তবে এতটুকু বলব যে, তা এমন এক মুসলিম মেয়ের নাম যাকে প্রত্যেক মুসলিম ভালোবাসে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার আশেপাশে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়?

রিডলে : তারা প্রথমে ব্যথিত হয়। বিশেষত আমার আম্মা। কেননা, পশ্চিমারা এমন আড়াল তৈরি করে রেখেছিল, যা ইসলামকে দেখার পথে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। এ আড়াল দূর করা গেলে অনেক পশ্চিমাই কিন্তু ইসলামে প্রবেশ করবে। কারণ ইসলামের আত্মিক প্রশান্তির জন্য তারাই সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী।

প্রশ্ন : কিছু দিন আগ থেকে আপনি হিজাব পরা শুরু করেছেন, এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি?

রিডলে : আমি নিজের জন্য মনে করি, হিজাব হলো মুসলিম নারীর সর্বোত্তম প্রতীক। এই হিজাবের বিরুদ্ধে অনেক সহিংসতা হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি, কোন শক্তি আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হিজাব পরিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– এটি আল্লাহ্র নির্দেশ। আখেরাতের চিরস্থায়ী জগতে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ছাড়া সৌভাগ্য আশা করা যায় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে বিষয়টি আমাকে চরমভাবে আলোড়িত করে, তা হলো, হজের মৌসুমে হিজাব পরিহিতা হাজার হাজার নারীর দৃশ্য। আমার তখনই মনে হলো যেন ফেরেশতাদের সৈন্যদের মাঝে আমি অবস্থান করছি। সত্যিই এ অনুভূতিটি ছিল খুবই চমৎকার।

প্রশ্ন : তুরস্কের বিদ্যালয়গুলোতে হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আপনার জানা আছে কি?

রিডলে : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

রিডলে : এ নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে গর্হিত; বিশেষ করে তা এমন এক দেশে যার সাথে ইসলামের নামটি সম্পৃক্ত। বাস্তবিকই এ বিষয়টি আমাকে চরমভাবে আশ্চর্যান্বিত করেছে।

প্রশ্ন : হিজাব পরিধানকারী একজন নারী হিসেবে যদি আপনার ওপর এরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তা হলে আপনি কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন?

রিডলে : আমি আমার অধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

প্রশ্ন : এ দেশে হাজার হাজার মেয়ে এ সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে, আপনি তাদের ব্যাপারে কী বলেন?

রিডলে : অধিকার অর্জনের প্রয়াসে আমি তাদেরকে সমর্থন করি। আমার ঐসব বোনদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই, তোমরা শেষ পর্যন্ত স্বীয় ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাও এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা রেখে এ সংগ্রামে লিপ্ত হও। বিজয়ের ব্যাপারে তোমরা হতাশ হবে না।

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যরা দাবি করছে, ইসলাম নারীদের অধিকার খর্ব করেছে। ইসলামে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

রিডলে : আমি কখনো এ কথা বুঝতে পারি না, পশ্চিমাদের এসব প্রপাগাণ্ডার পিছনে কি কারণ রয়েছে? কেননা, ইসলাম নারীদেরকে যে মূল্যায়ন করেছে সেটিই তো আমাকে বেশি প্রভাবিত করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাত মায়ের পদতলে। পুরুষদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে পরিবারের সাথে সদাচরণকারী। এটি একটি চমৎকার বিষয়। সন্তান প্রসবের জন্য ইসলাম নারীদের বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। মাকে সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ভূষিত করেছে। আমার দৃষ্টিতে একজন সৎ মা-ই হলো মুসলিম নারীর সর্বোৎকৃষ্ট গুণ।

প্রশ্ন : ইরাক, ফিলিস্তীন সংক্রান্ত নানা কর্মসূচিতে আপনার ব্যাপক অংশগ্রহণ আমরা লক্ষ্য করি। ফিলিস্তীনে হামাসের বিজয় সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

রিডলে : নির্বাচনে হামাসের বিজয়ের সংবাদটি ছিল আমার জন্য সে সময় সবচেয়ে আনন্দদায়ক বিষয়। এটি ছিল আমাদের সিংহশার্দুল প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিজয়। আমার দু'নয়ন দিয়ে পানি এসে যায় এবং আমি আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া স্বরূপ সিজদায় লুটিয়ে পড়ি। শেখ আহমাদ ইয়াসিনের দৃশ্যগুলো বারবারই আমার চোখে ফুটে উঠতে থাকে।

প্রশ্ন : প্রায় এক সপ্তাহ যাবত পশ্চিমা পত্রিকাগুলো মহানবী (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপিয়ে চলছে। এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?

রিডলে : পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে আমি আরেকবার ক্রোধ লক্ষ্য করলাম। এ ধরনের ঘৃণ্য বিষয় বরদাশ্ত করা যায় না। পাশ্চাত্য অনুধাবন করতে পারেনি, মুসলমানদের হৃদয়গুলোতে মহানবী (ছাঃ)-এর বিশাল স্থান রয়েছে। তিনিই তো আমাদের সবকিছু। যে প্রতিক্রিয়া আমার ভাইয়েরা বিশ্বব্যাপী প্রদর্শন করেছে তা আমাকে আনন্দিত করেছে। টিভির পর্দায় যখন মুসলমানদের বিক্ষোভ সমাবেশগুলোর দৃশ্য দেখি তখন আমার মনে হয়, বিশ্বের প্রতিটি স্থানে আমার ভাইদের অস্তিত্ব রয়েছে। আমি মুসলমানদের ভালোবাসি এবং অনুধাবন করি, আমার এই অনুভূতিই হলো ঈমান।

প্রশ্ন : তুর্কী জনগণের জন্য আপনার পয়গাম কী?

রিডলে : তাদেরকে ইসলামী আবেগভরা সালাম রইল আমার পক্ষ থেকে। মুসলমান হিসেবে আমাদের অনেক কিছু করণীয় রয়ে গেছে। ইসলামের বাণী সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে হবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্যাতন বন্ধেও আমাদের কাজ করতে হবে। আমি আপনাদের দেশে এসেছি যাতে ইরাক ও ফিলিস্তীনে দখলদারিত্ব অবসানে কিছু করতে পারি। চুপ করে বসে থাকা ছাড়াও আমাদের প্রত্যেকের অনেক কাজ রয়েছে। আপনারা জাগ্রত হোন। ছড়িয়ে যান। নানা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করুন। দখলদারদের পণ্য বয়কট করুন। আল্লাহকে আহ্বান করুন। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলুন। এ আওয়াজ দ্বারা দুনিয়াকে পরিপূর্ণ করে দিন। 'আল্লাহু আকবার' সর্বোৎকৃষ্ট শব্দ। আগামীকাল আমাদের বিজয় সংবাদ আসবে।

মক্কায় একান্ত সাক্ষাৎকারে র‍্যাডলি

আবরার আহমাদ : আফগানিস্তানে আপনার প্রবেশ এবং অন্তরীণ থাকাকালীন তালেবানদের সাথে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে কিছু বলুন।

রিডলে : আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনাটি ছিল তালেবানদের নিকট আমি বন্দি হওয়ার পর। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি বেআইনিভাবে আফগানিস্তানে প্রবেশ করি। এটি ছিল ১১ই সেপ্টেম্বরের পর। আসলেই আমি পরিচয় গোপন করে বোরকা পরিধান করে বেআইনিভাবে আফগানিস্তানে প্রবেশ করি। দশ দিন আমি বন্দি ছিলাম। মোল্লা ওমরের ব্যক্তিগত নির্দেশে পরে আমার মুক্তি হয়। এ অন্তরীন থাকাকালীন পুরো সময়টি জুড়ে আমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে এক প্রচণ্ড ভীতি আমার উপর চেপে বসেছিল। অথচ বরাবর তালেবানরা আমার সাথে ন্যায় ও সৎ ব্যবহার করে যাচ্ছিল। বিশ্ববাসীকে আমি এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই, বন্দি থাকাকালীন আমি কোন প্রকার লাঞ্ছনা, দুর্ব্যবহার এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হইনি। আমাকে কোন হয়রানি করা হয়নি। বিশ্ববাসীর কাছে আমি এটাও স্বীকার করতে চাই, আমি আল্লাহ্‌র কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ যে, আমার গ্রেফতারি ছিলো একটি 'বর্বর ও হিংস্র' গোষ্ঠীর হাতে; মার্কিনীদের হাতে নয়। মুক্তির কিছুদিন পরেই আমি কোরআন শরীফ পড়তে শুরু করলাম। জনৈক তালেবান মোল্লা আমাকে এই কুরআনটি হাদিয়া দিয়েছিলেন। জালালাবাদের বন্দিশালায় তিনি আমার সাথে দেখা করেন। আমি তাকে চিনতে পারছি না এবং আমার মনে হয় তিনি কোন সাধারণ আফগানী নন। কেউ যদি আমাকে এখনো সেই ভদ্রলোকের পরিচয় দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করতে পারে তাহলে আমি কৃতজ্ঞ হবো। কেননা, এটি এমনি অনেকগুলো বাস্তব বিষয়ের অংশ, যা এখনো পরিপূর্ণ হয়নি। যাহোক, সমস্ত আশা ও প্রত্যাশার বিপরীতে তালেবানরা আমাকে মুক্তি দিল। এটি ছিল ঐ সকালে যার আগের রাতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে হামলা শুরু করে এবং সে হামলায় অসংখ্য নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। আমি বিরামহীনভাবে কুরআন শরীফ অধ্যয়ন এবং গবেষণা চালিয়ে গেলাম। এই দিনগুলি ছিল আমার জীবনে চমৎকার আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের সূচনা। আর এখন তো আমি মক্কায় হজ করতে এসেছি, ঐ পোশাকেই যে পোশাক আমি আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের বন্দিশালায় পরিহিত ছিলাম। কেননা, এ ধরনের পোশাক (ইসলামী পোশাক) এক বিশেষ প্রতীকের প্রতিনিধিত্ব করে; যার পটভূমি ও ফলাফল আমি পরে অনুধাবন করতে পেরেছি।

আবরার আহমাদ : এখন আপনার অনুভূতি কেমন? এবং এই আধ্যাত্মিক ভ্রমণকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

রিডলে : আমি আপনাকে সবচেয়ে গভীর আবেগময় এক অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। একদিন আমি পবিত্র কাবার পথে চলছিলাম, কিন্তু মানুষের চাপে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে আমি হারাম শরীফে প্রবেশ করতে পারছিলাম না। এ ছিল এক অস্বস্তিকর অবস্থা। হঠাৎ ছালাতের জন্য আযানের ধ্বনি শুরু হলো। আর অমনি কয়েক মিনিটের মধ্যে এই উপচে পড়া মানব ভিড় কাতারে কাতারে সুশৃঙ্খল হয়ে পড়ল পূর্ণ শান্ত ভাবেই। আমি মনে করি, দুনিয়ার কোন বিশাল সামরিক বাহিনীও এই ডিসিপ্লিন দেখাতে পারবে না। আমি মনে মনে যেন চিৎকার করে বলতে লাগলাম, আল্লাহ্‌র বাহিনীর চেয়ে কোন বাহিনীই অধিক আনুগত্যশীল ও শক্তিশালী ডিসিপ্লিনের অধিকারী হতে পারবে না। তবে দুঃখের বিষয়, মসজিদের বাইরে এমন ধরনের ঐক্যের প্রতিকৃতি আঁকতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমরা ব্যর্থ হয়েছি আমাদের শক্তি প্রদর্শন করতে। আমরা যদি ঐক্যের শক্তি দ্বারা একতাবদ্ধ হতাম তাহলে দুনিয়াতে কেউ আমাদের ভূখণ্ডে আগ্রাসন অথবা আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখাতো না। আমাদের জনগণকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হতো। দুঃখের বিষয় মসজিদের বাইরে আমরা এই শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছি। যাইহোক, হারাম শরীফের এই সময়গুলো আমার জন্য আলোকিত মুহূর্ত ছিল; যা বিশ্বে একটি বৃহত্তম ও সর্বোত্তম পরিবারের সাথে আমার সম্পৃক্ততার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি গর্বের সাথে এটাও অনুধাবন করি, কোনো একদিন ঐসব ভাই-বোনের সাথে কোনো না কোনো স্থানে দেখা হবে যখন নূরের পথে চলার জন্য তারা আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, তারা অতি দ্রুত আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আসবেন। আমি এটাও অনুভব করছি, মুসলমান ভাইদের যে কোন কাজে সমানভাবে আমিও এগিয়ে যাবো।

আবরার আহমাদ : আপনার বর্তমান কর্মব্যস্ততা কী?

রিডলে : আমি বর্তমানে একটি সংগঠনের সাথে জড়িত। যার নাম 'স্টপ পলিটিক্যাল টেরর'। সংস্থাটি বৃটিশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি মুসলমানদের সাহায্যার্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটিশের এই কারাগারটি গুয়ান্তানামোর মতোই; যেখানে বিনা বিচারে কোনো অভিযোগ ছাড়াই মুসলমানদেরকে বন্দি রাখা হয়েছে। আমরা তাদের মানবাধিকার রক্ষায় ও লজ্জাজনকভাবে বন্দি করে রাখার বিরুদ্ধে নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি। এভাবে আমি আরেকটি সংস্থার সাথে জড়িত যার নেতৃত্বে রয়েছেন জর্জ জালাবি। এটি রাজনৈতিক সংস্থা। আগামী ইলেকশনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক। যদি আমি এই নির্বাচনে সফল হতে পারি তাহলে আমি হব প্রথম বৃটিশ নারী যিনি হিজাব ধারণ করে পার্লামেন্টে প্রবেশ করবেন।

আবরার আহমাদ : কোন এলাকা থেকে আপনি নির্বাচন করবেন?

রিডলে : লেস্টার শহরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে। যেখানে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দি ও গুজরাটিদের বসবাস রয়েছে। তারা আমাকে ভালো করেই চিনে এবং আশা করি আমি তাদের আস্থা অর্জন করতে পারব; যা আমাকে তাদের পক্ষে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এনে দিবে।

আবরার আহমাদ : কী কারণগুলো আপনাকে ইসলাম গ্রহণের দিকে উদ্বুদ্ধ করেছে? তালেবানদের সদ্ব্যবহার, না কুরআন শরীফ অধ্যয়ন?

রিডলে : বন্দিত্বের ষষ্ঠ দিনে জালালাবাদে জনৈক শায়খ আমাকে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ আছে কি না জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম, তাড়াহুড়ো করে এই মুহূর্তে আমি এমন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারব না, যা আমার জীবনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। আর আমিতো কারাগারের মধ্যেই। কিন্তু তোমরা আমাকে মুক্তি দিলে আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, আমি গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন এবং ব্যাপকভাবে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করব। এই সাক্ষাতের আধাঘণ্টার মধ্যেই আমাকে রাজধানী কাবুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমাকে একটি অস্বস্তিকর কারাগারে রাখা হয়। এর কারণ প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। পরে আমি জানতে পেরেছি, মোল্লা ওমর আমাকে প্রথমে পুরুষ মনে করেছিলেন। তাঁকে শুধু এতটুকু সংবাদ দেয়া হয়েছিল, একজন পশ্চিমা সাংবাদিক আটক হয়েছে। শুধু এতটুকু জেনেই তিনি আমার বিষয়টা নিয়ে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখছিলেন। পরে তার এক উপদেষ্টা তাকে এ কথা অবগত করেন, আমি একজন মহিলা, পুরুষ নই। এটা জানতে পেরে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এ কারণে যে, আমি এমন একজন মহিলা

যার সাথে কোন নিকটাত্মীয় বা মহিলা সাথী নেই। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে কাবুলের মহিলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মনে হয় এই ধরনের বিষয়টি (পুরুষদের মাঝে একা মহিলার অবস্থান) তালেবানদের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার জন্য মোল্লা ওমরের সিদ্ধান্তের অর্থ ছিল জালালাবাদের অতি আরামদায়ক কারাগার থেকে কাবুলের নোংরা কারাগারে অবস্থান। মোল্লা ওমর এজন্য চিন্তিত ছিলেন নারীসঙ্গী ব্যতীত আমি অসহায়ের মতো। আর এটি শরী'আতের পরিপন্থী।

আবরার আহমাদ : আপনার দৃষ্টিকোণে আপনি মনে করছেন যে, তালেবানরা শরঈ কারণেই কাবুলের কারাগারে স্থানান্তর করে আপনার প্রতি ইনসাফ করেছে। তবে আপনি কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করার ব্যাপারে তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

রিডলে : ভালো কথা। আমি যখন লণ্ডনে নিরাপদে কোন আঘাত ছাড়াই ফিরে যাই, তখন আমি বিশ্বাস করলাম আমাকে মুক্তি দিয়ে তালেবানরা তাদের কথা ও প্রতিশ্রুতি রেখেছে সবরকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। বিশেষ করে যখন তালেবানদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাচ্ছিলো, তখন তো কেউ আমাকে জীবিত দেখবে তা কল্পনাও করেনি। তালেবানরা ওয়াদা রক্ষা করেছে। এবার আমি অনুভব করলাম, এখন ওয়াদা রক্ষার পালা আমার। অতঃপর আমি কুরআন পড়তে শুরু করলাম। আমাকে একজন শায়খ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর কুরআনের একটি চমৎকার অনুবাদ কপি উপহার দেন। আমি তৎক্ষণাৎই কুরআন শরীফের ঐসব আয়াত খুঁজতে লাগলাম যেগুলো নারীদের সংশ্লিষ্ট। কেননা, ইসলাম নারীদেরকে পশ্চাদপদ রেখেছে এই ধারণাটির বাস্তবতা সম্পর্কে জানার জন্য আমি দারুণভাবে পিপাসিত ছিলাম। কুরআনের দুই মলাটের মাঝে আমি তো এই ধারণার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি। আমি তাই পেয়েছি যা আমি এতদিন শুনিনি। শিক্ষা, বিয়ে, উত্তরাধিকার সম্পদ এবং অন্যান্য অধিকারসমূহ আমি এটাও জানতে পেরেছি যে, যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন একজন নারী। ইসলামের প্রথম শহীদও ছিলেন একজন নারী। আরো জানি, আল্লাহ তো জান্নাতকে মায়েদের পদতলে করেছেন। রাসূলের এই হাদীছ সম্পর্কে অবগত হই যেখানে তিনি জনৈক ব্যক্তির এই প্রশ্ন 'আমি কার সাথে উত্তম ব্যবহার করবো'-এর উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার মায়ের সাথে'।

আবরার আহমাদ : আপনার বর্তমান কার্যক্রম কী?

রিডলে : আমি বর্তমানে 'ইসলামিক চ্যানেল' নামে একটি টিভি চ্যানেলে কর্মরত আছি, ইউরোপের সর্বত্র তার পরিধি বিস্তৃত। আপাতত আমাদের প্রোগ্রাম সীমিত হলেও ভবিষ্যতে আমাদের রয়েছে বড় পরিকল্পনা। আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের প্রোগ্রাম বিস্তৃত করতে সচেষ্ট। সেখানে ইউরোপের বাইরের দেশগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতি শীঘ্রই আমরা ইংরেজী ভাষায় সংবাদ প্রচারের জন্য কাজ শুরু করব। তবে চ্যানেলটিতে আমার কাজ হল, সপ্তাহব্যাপী প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম উপস্থাপন করা, যেখানে আমি বিশেষভাবে বৃটিশ মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে থাকি; যার লক্ষ্য হল, মুসলমানদের উন্নয়নের পথে সহায়ক বিষয়গুলো তুলে ধরা। চ্যানেলটির এক অধিবেশনে দেখা যায়, সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে আয়ারল্যান্ডের জনৈক মহিলা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দিয়েছেন। আর স্টুডিওতে যে শায়খ আমাদের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি ঐ ভদ্র মহিলাকে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করালেন। ঐ মুহূর্তগুলো ছিল চমৎকার ও ঐতিহাসিক। এটি ছিল আমাদের টিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে কালেমায়ে শাহাদাতের প্রথম ঘোষণা।

সত্যিই আমি যা চাচ্ছি তা হল, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা; যা তারা ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে হারিয়ে ফেলে। আমি বলতে চাই, আমাদের উচিৎ ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার বিষয়ে এত বেশি ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, কোনো অবস্থাতেই আমরা তার জন্য দায়ী নই। আর এটি শেষ ঘটনাও নয়। বলুন তো, ফিলিস্তীনের বর্বরতার জন্য সকল ইহুদিকে কি সমানভাবে দোষারোপ করা যাবে? তেমনি ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ব্যাপারেও সব মুসলমানকে অভিযুক্ত করা যায় না।

শায়খুল আযহার ও মিসরীয় মন্ত্রীর সমালোচনায় র‍্যাডলি

ইসলাম গ্রহণের পর বিভিন্ন আরব দেশের অসংখ্য সেমিনারে তিনি যোগদান করেন; ভ্রমণ করেন বিভিন্ন মুসলিম দেশ। মুসলিম দেশে তার সেই ভ্রমণের প্রাক্কালে অতি কৌতূহলপূর্ণ একটি অভিজ্ঞতা তিনি উল্লেখ করেন। ঘটনাটি মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ মুসলিম ব্যক্তিত্ব শেখ সৈয়দ আলী তানতাভী সম্পর্কিত, যিনি বর্তমান 'শায়খুল আযহার' পদটি অলংকৃত করে আছেন। ইভোন রিডলে যখন তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন, তখন হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে অভ্যর্থনা জানাতে 'শায়খুল আযহার' উদ্যত হলে রিডলে নিজেকে তা থেকে বিরত রাখেন। প্রত্যুত্তরে বিব্রত শায়খ বলে উঠলেন, 'তুমি মৌলবাদী'। আযহারের রেক্টর তার আশেপাশের লোকদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, 'এ ধরনের (রিডলে) যারা নতুন ইসলামের দাওয়াত দ্বারা মুসলিম সমাজে অন্তর্ভুক্ত হন, তারা কেবল মৌলবাদী বক্তব্য ও কণ্ঠ ছাড়া অন্য কারো অনুকরণ করে না।' রিডলে শায়খুল আযহারের এসব বাজে উক্তির সমালোচনা করে বলেন, 'আমি কোনো বিশেষ দল বা শায়খের আনুগত্য জরুরী মনে করি না, আমি শুধু সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ্র কথাই বুঝি'।

২০০৬ সালে তিনি মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত মুসলিম সংস্থা (WAMY)-এর দশম সম্মেলনে মিসরের মন্ত্রী ফারুক হাসানের কড়া সমালোচনা করে তাকে বহিষ্কারের দাবি করেন। উক্ত সম্মেলনে রিডলে বলেন, আমি মিসরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে জানতে পেরেছি, এই মন্ত্রী মুসলিম নারীদের হিজাবকে পশ্চাদপদতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর চিহ্ন বলে আখ্যা দিয়েছেন। মিসরের জনগণকে আমি জিজ্ঞাসা করব, তারা কেন এমন লোককে স্তব্ধ করতে পারলেন না, যে হিজাব ধারণকারী প্রতিটি নারীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে। তার এসব উক্তি অত্যন্ত কদর্যপূর্ণ ও ঘৃণ্য। এসব লোক যারা পশ্চিমাদের চেয়েও বেশি পশ্চিমা হতে চাইছে তাদের মুসলিম দেশের মন্ত্রীত্বের পদে থাকার কোন যোগ্যতা নেই। তাদেরকে স্বীয় পদ থেকে বহিষ্কার করা উচিৎ।

তিনি আরো বলেন, হিজাব পাশ্চাত্যের নেতিবাচক জীবন যাপনকে প্রত্যাখ্যানের প্রতীক। এটি পশ্চিমাদের জন্য একটি নৈতিক বার্তা। অর্থাৎ আমরা তোমাদের মত জীবন ধারণ করতে চাই না। মিসরীয় মন্ত্রীর মত যেসব লোক পাশ্চাত্যদের চেয়েও বেশি নিজেদের পাশ্চাত্য প্রমাণ করতে চায়; তারা সর্বদা অন্যের প্রতি বিদ্রূপ ছড়িয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়। উক্ত সম্মেলনে তিনি দেশে দেশে মুসলিম নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে এর জন্য মুসলমান শাসকদেরকেও অভিযুক্ত করেন।

স্পেন বিজয় : ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

- ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে স্পেন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। প্রাচীনকালে স্পেন আইবেরীয় উপদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। অপরূপ সুন্দর এই উপদ্বীপটি মুসলিম শাসনামলে আন্দালুস নামে পরিচিতি লাভ করে। এটি ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ২,৯৫,১৪০ বর্গমাইল। চারদিকে প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর ও পশ্চিমে বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং পূর্বে পীরেনীজ পর্বতমালা। স্পেনের একটি বিশাল অংশ পীরেনীজ পর্বত দ্বারা গঠিত। চৌদ্দ মাইল প্রশস্ত জিব্রাল্টার প্রণালী উত্তর আফ্রিকা এবং তিনশ' মাইল দীর্ঘ পীরেনীজ ফ্রান্স ও ইউরোপের অবশিষ্ট ভূ-খণ্ড হতে একে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এটি আফ্রিকার সাথে ইউরোপ মহাদেশের যোগসূত্র রচনা করে এবং ভূমধ্যসাগরে নৌচলাচলের মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের সাথে সম্পর্ক রজায় রাখে। পীরেনীজ পর্বতমালার পরেই ফ্রান্সের অবস্থান।

স্পেনে মুসলমানদের আগমন :

ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত স্পেনে ৭১১ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানগণ ৭১১ থেকে ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় আটশ' বছর স্পেন শাসন করেন। পবিত্র কুরআনের বাণী ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নির্দেশ তাদেরকে দেশ বিজয়ে উৎসাহ যোগায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর খলীফা আবুবকর (রা.) তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে (৬৩২-৬৩৪ খ্রী.) বহিঃর্বিশ্বের দিকে তেমন মনোনিবেশ করতে পারেননি। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রা.)-এর শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রী.) ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায় সূচিত হয়। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবারও দেশ বিজয়ের কার্যক্রম কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে। তবে উমাইয়া খলীফা আল-ওয়ালিদের রাজত্বকালে (৭০৫-৭১৫ খ্রী.) মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রবল গতি সঞ্চারিত হয়। সাম্রাজ্য বিস্তারে ওয়ালিদের গৌরব ইতিহাসে চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। খলীফা ওমরের সময় বিজয়ের যে সূচনা হয়েছিল, তার সার্থক রূপ লাভ করে আল-ওয়ালিদের সময়। এ সময় মুসলিম আধিপত্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে সম্প্রসারিত হয়। দক্ষিণ-পূর্বে আমুরদরিয়া হতে উত্তর-পশ্চিমে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। এ সুবিশাল সাম্রাজ্য বিস্তারে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, কুতাইবা, মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিক বিন যিয়াদ, মূসা বিন নুসাইর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিশ্ববরেণ্য রণনিপুণ মূসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের শৌর্যবীর্য, পরাক্রম ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। খলীফা আল-ওয়ালিদ ৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ইয়ামানের অধিবাসী মূসা বিন নুসাইরকে ইসান বিন নোমানের স্থলে উত্তর আফ্রিকার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। মূসা তাঁর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ৭০৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকাকে মিসরের আওতা হতে সরাসরি দামেস্কের অধীনে আনেন। বার্বার বাইজান্টাইনদের মিলিত শক্তিকে মূসা পরাজিত করে মরক্কো (তিউনিসিয়া), তাঞ্জিয়ারসহ সমগ্র আফ্রিকাতে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর মূসা ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল আইবেরিয়ান উপদ্বীপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানী কার্থেজ থেকে বাইজান্টাইনগণ বিতাড়িত হয় এবং তিউনিসে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম বাহিনী সমগ্র উত্তর আফ্রিকা বিজয় করে দুর্বার গতিতে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর সংযোগকারী জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে ইউরোপে প্রবেশ করে। তারা অতি দ্রুতগতিতে ফ্রান্সের প্রবেশদ্বার পীরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করার আকাঙ্খায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। মুসলমানগণ আলজেরিয়া হয়ে মরক্কোতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা বার্বারগণ বাধার সৃষ্টি করে। তিউনিসিয়ার গভর্ণর মূসা বিন নুসাইর ৭০৮ খ্রীস্টাব্দে তাদের প্রতিরোধ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে মূসা বিন নুসাইর তাঁর পক্ষ হতে আবু যুর'আ তারীফ নামক একজন বার্বার মুসলিম যুবককে এ অভিযানে প্রেরণ করেন। আর তারীফকে এ অভিযানে প্রেরণের একটি কারণও ছিল-যা ইবনুল 'ইযারী তার 'আল-বায়ানুল মুগরিব ফী আখবারিল আনদালুস ওয়াল মাগরিব' এ উল্লেখ করেছেন যে, জাযীরাতুল খাদরা বা সিউটার গথিক গভর্ণর জুলিয়ান তদানীন্তন আফ্রিকার মুসলিম গভর্ণর মূসা বিন নুসাইরের নিযুক্ত তানজার শাসক তারিক বিন যিয়াদের মাধ্যমে মূসা বিন নুসাইরকে স্পেন অভিযান পরিচালনা করার অনুরোধ জানান। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 'সেসময় ইফ্রিকিয়া মুসলমানদের অধীনে সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের আশীর্বাদ লাভ করে জাগতিক উন্নতির দিকে অগ্রসরমান ছিল, তখন নিকটবর্তী আইবেরীয় উপদ্বীপ ভিজিগথ শাসনের লৌহকঠিন পদতলে পিষ্ট হচ্ছিল।' এমতাবস্থায় কাউন্ট সিউটার গভর্ণর জুলিয়ান এবং উত্তর আফ্রিকার স্পেনীয় উদ্বাস্তুদের অনুরোধে মূসা বিন নুসাইর স্পেন অভিযানে নেতৃত্বদানের জন্য দামেস্কের খলীফা আল-ওয়ালিদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা আবেদন মঞ্জুর করেন। মূসার প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ স্বরূপ জুলিয়ানের অনুগত কিছু ব্যক্তি ৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেন আক্রমণ করেন। অন্যদিকে মূসা তাঁর ভৃত্য তারীফকে ৭১০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৪০০ পদাতিক ও ১০০ অশ্বারোহী বার্বার সৈন্যসহ স্পেনের দক্ষিণ উপকূল জরিপ ও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। তারীফ যে দ্বীপটিতে অবতরণ করেন সেটি আজও 'তারীফা' নামে তার স্মৃতি বহন করছে। তারা ৪টি জাহাজযোগে স্পেন পৌছেন। তারীফ পরিস্থিতি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ নিয়ে মূসার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন এবং অভিযান পরিচালনার অনুকূলে রিপোর্ট পেশ করেন। মূসা এ অভিযানে তারিক বিন যিয়াদকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে বলেন, 'বৎস তোমার ওপর অত্যন্ত কঠিন দায়িত্বভার অর্পণ করছি। এ বিশাল দেশ জয় করার জন্য আমার ছেলেদের বাদ দিয়ে তোমাকেই নির্বাচিত করছি। আগামীকাল শুক্রবার সালাতের পরই তুমি জাহাজ নিয়ে যাত্রা করবে।' এরপর মূসা খলীফা আল ওয়ালিদের আদেশানুক্রমে ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল (৯৯ হিজরীর ৮ই রজব) ৩০০ আরব ও ৭০০০ বার্বার সৈন্যের একটি দল তাঞ্জিয়ারের (Tangiers) শাসনকর্তা প্রখ্যাত সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে স্পেন প্রেরণ করেন। এ সময় সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে মূসা এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি নিম্নরূপ-

> 'তারিকের অধিনায়কত্বে তোমরা শীঘ্রই যাত্রা করছ। তোমরা সকলেই জান সে বয়সে তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। তোমাদের অনেকেই আছ, যারা তারিকের চেয়েও বয়সে বড় এবং তার চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ। কিন্তু তার মধ্যে নেতৃত্বের এমন সব গুণাবলী রয়েছে যা অধিকাংশ লোকের মধ্যে দুর্লভ। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণীতে তোমরা আজ মুসলমান। সুতরাং

তোমরা জান নেতার প্রতি আনুগত্য বলতে কি বুঝায়। তোমাদের নেতার প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে ইসলামের যা নির্দেশ রয়েছে তোমরা অবশ্যই তা পালন করবে। স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে না আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে তাদের ওপর। আল্লাহ এবং তাঁর দয়ার প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা রেখ। জয় তোমাদের হবেই।'[২]

ওয়াকিদী বলেন, 'মূসা বিন নুসাইরের আমিল তারিক বিন যিয়াদ হিজরী ৯২ সনে আন্দালুস আক্রমণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আন্দালুস অভিযানে যান।' কাউন্ট জুলিয়ান কর্তৃক প্রেরিত ৪টি জাহাজে তারিক বিন যিয়াদ জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের পার্বত্য অঞ্চলে অবতরণ করে তা দখল করেন।

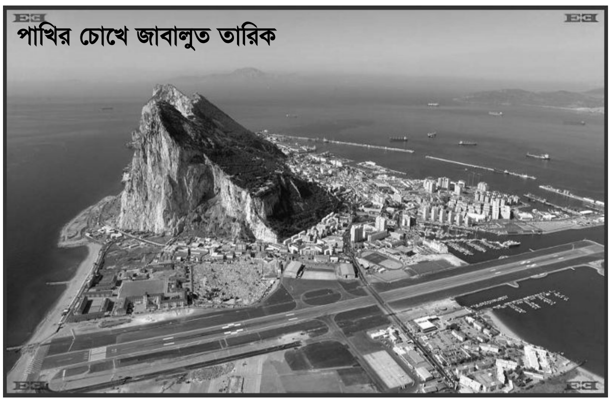
পাখির চোখে জাবালুত তারিক

স্পেনের মাটিতে নেমে তারিক একটি পাহাড়ের ওপর আরোহণ করেন এবং সেখানে উড্ডীন করেন ইসলামের পতাকা। এ স্থানে অবস্থানকালে তারিক তাঁর নৌবহরের অধ্যক্ষ বদরকে ডেকে সকল জাহাজ পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ করেন। তরুণ ও দুঃসাহসী তারিক সুস্পষ্ট ভাষায় বদরকে জানিয়ে দেন, 'আমরা আর ফিরে যাচ্ছিনা বদর। আমরা থাকতেই এসেছি। আল্লাহর রহমতে আমরা জয়লাভ করবই। এদেশ আমরা শাসনও করব।' তাঁর আদেশ মত জাহাজগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরদিন তিনি স্পেনের অভ্যন্তরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যাত্রাকালে মুজাহিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন তারিক। ভাষণটি নিম্নরূপ-

'ভাইসব আমরা আজ স্বদেশ থেকে অনেক দূরে। আমাদের প্রিয় স্বদেশ এবং এ শত্রু দেশের মাঝে রয়েছে এক বিশাল গভীর সমুদ্র। আমাদের দেশ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি না। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ভেব না, তোমরা নিঃস্ব একাকী। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে আছেন। আমি জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি, যাতে তোমাদের মন থেকে দেশে ফেরার সম্ভাবনা মুছে ফেলতে পার। আমরা এসেছি, হে বন্ধুগণ! ফিরে যেতে নয়। বরং এসেছি, এ দেশকে স্বদেশ ভূমিতে পরিণত করতে। যদি আমাদের বিপদ কিছু ঘটেই, তবে এই জাহাজগুলো আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। শুধু আল্লাহর ওপরই আমাদের ভরসা করা উচিত। আমরা সেই আল্লাহরই বান্দা যিনি তাঁর রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতদেরকে সাহায্য করেছিলেন বদর, হুনায়ন, কাদেসিয়া, আজনাদাইনের রণক্ষেত্রে ঘোর বিপদের মাঝে। আমরা যুদ্ধ করছি সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। পার্থিব ধন সম্পদ কিংবা ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়। আমরা এক অদ্বিতীয় আল্লাহতে বিশ্বাসী, যিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সাহায্য করেছেন অবিশ্বাসীদের দেশে এবং কুতাইবা বিন মুসলিমকে সাহায্য করেছেন সুদূর তুর্কিস্তানে। আমরাও যদি মুহাম্মদ বিন কাসিম ও কুতাইবার ন্যায় একই উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ করি, যদি থাকে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিকতা, তবে আমরাও পাব জয়মাল্য। এস, আমরা ধর্মের পথে হই গাযী অথবা শহীদ।'

তারিকের স্মৃতি বিজড়িত সেই স্থান আজও জাবালুত তারিক (তারিকের পর্বত) নামে তাঁর স্মৃতি বহন করছে। পরবর্তীকালে তিনি সেখানে 'রাবাত' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ পাহাড়টি

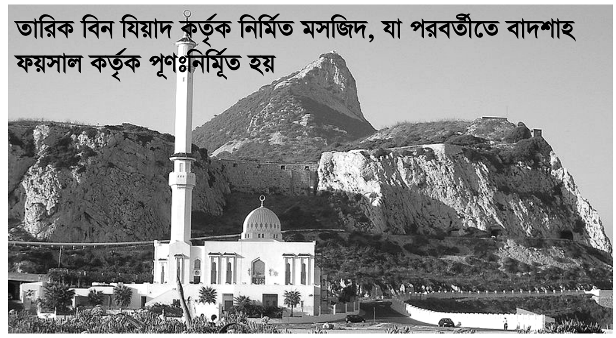
তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ, যা পরবর্তীতে বাদশাহ ফয়সাল কর্তৃক পূণঃনির্মিত হয়

পরবর্তী আক্রমণ পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করে জিব্রাল্টার থেকে উপকূল পথে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। তারিক একটি আরবীয় ঘোড়ায় চড়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুসলিম বাহিনী সকল বাধা অতিক্রম করে কার্থেজ' ও 'লাগুন দে জান্দা' অধিকার করেন। স্পেনের মার্সিয়া প্রদেশের গভর্ণর থিওডোমী রডারিককে মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ প্রেরণ করেন। থিওডোমীর রডারিককে লিখেন-

'মহামহিম রাজা, আমাদের দেশ যাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের নামধাম কিছুই জানি না। এমনকি আমি বলতে পারছি না তারা কোত্থেকে এসেছে, তারা কি আকাশ থেকে নেমে এসেছে, না পাতাল ফুড়ে এসেছে তা জানি না। তাদের সংখ্যা ৭,০০০ বেশী হবে না। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সাধারণ, অস্ত্রশস্ত্র হালকা। তাদের অশ্বের সংখ্যাও খুব কম। কিন্তু তারা এতই সাহসী যে তা চিন্তাও করা যায় না। তাদের গতি ক্ষিপ্র। তাদের শিবিরে তারা মিষ্টভাষী, কোমল অন্তঃকরণের লোক। তাদের সুন্দর ব্যবহার মানুষের অন্তরকে জয় করে। তারা ভদ্র এবং মিষ্ট। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তারা সিংহের চেয়েও সাহসী, বাঘের চেয়েও হিংস্র। তারা বিদ্যুতের মতই ক্ষিপ্র। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়ায়। পাহাড় ভেদ করা সম্ভব। কিন্তু তাদের ব্যূহ ভেদ করা যায় না। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাদের সেনাপতি একজন সুদর্শন তরুণ। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, তিনি একজন সাধারণ সৈনিকের মত পোশাক পরিধান করেন এবং একজন সাধারণ সৈনিকের মতই অস্ত্রসজ্জিত। অথচ সকলেই তাকে সম্মান করে। আমাদের পবিত্র দেশ থেকে এ আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করার জন্য আমি ৩টি যুদ্ধ করেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি পরাজিত হয়েছি। যদিও আমার সৈন্যবাহিনী তাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী ছিল। আমার সৈন্যরা এ বিদেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আর সাহস পাচ্ছে না। তারা ভীত হয়ে পড়েছে। এ আক্রমণকারীদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করে আমাদের পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।'

স্পেনে মুসলমানদের আগমনের সংবাদে আতঙ্কিত রডারিক অতি দ্রুত অন্যান্য সামন্ত নৃপতিদের সেনাসহ ১ লক্ষের একটি সম্মিলিত বাহিনী

সুসজ্জিত করেন। এই বাহিনীর সঙ্গে অনেক রাজপুত্র ও খ্রিস্টান পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতরা ক্রুশ হাতে নিয়ে এসেছেন খ্রিস্টান যোদ্ধাদের আশীর্বাদ করতে এবং মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে। রডারিকের প্রস্তুতির খবর পেয়ে তারিক আরো সৈন্য পাঠানোর জন্য আফ্রিকায় অবস্থানরত মূসাকে অনুরোধ জানান। ফলে আফ্রিকা থেকে আরো ৫,০০০ বার্বার অশ্বারোহী সৈন্য আসে তারিকের শক্তি বৃদ্ধি করতে। এ নবাগত অশ্বারোহী বাহিনী ছিল বিভিন্ন যুদ্ধে জয়ী এবং যুদ্ধের কঠোরতায় অভ্যস্ত। সর্বোপরি তারা ছিল ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এবং নেতৃত্বের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে (৯২ হিজরীর ২২ রজব) 'লূকা' উপত্যকায় গোয়াদিলেট নদীর উপকূলে মেদিনা সিদনিয়ার শহর ও হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখী হয়। তারিকের সেনাবাহিনীতে মুবিস আর-রূমী নামে একজন গ্রীক মুসলমান সৈনিক ছিলেন। তারিক ইসলামের মহান ঐতিহ্য অনুযায়ী মুবিস আর-রূমীর নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি পাঠালেন রডারিকের নিকট শান্তির প্রস্তাব দিয়ে। রূমী রডারিককে বললেন,

'হে স্পেনীয় নরপতি, আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমরা এসেছি সাগরের ওপারের এক দেশ থেকে। বেশী দিনের কথা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের মত এবং আপনার মত আমরাও নিমজ্জিত ছিলাম পাপ পঙ্কিলতায়। লজ্জাজনক কাজ করতাম। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে একজন সর্বশেষ পয়গম্বর নিযুক্ত করে আমাদের ওপর তার অপার করুণা বর্ষণ করেছেন। সেই মহামানব আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। অল্প সময়ের ভেতর এক অলৌকিক পরিবর্তন এনে দিয়েছেন আমাদের মধ্যে। তিনি তার মহান শিক্ষা এবং কার্যাবলী দ্বারা বদলে দিয়েছেন জীবন সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব দৃষ্টিভঙ্গি। অধঃপতনের গভীর গহ্বর থেকে তিনি আমাদের তুলে এনেছেন। যে আলোকবর্তিকা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাই আমরা বহন করে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। আমরা তার বাণী বহন করে ফিরছি মরুভূমি, সমভূমি এবং উপত্যকায়। আমরা আপনার নিকট এসেছি এ আশা নিয়ে যে, আপনাকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারব এবং সঠিক পথ দেখাব। আমরা এসেছি আপনাকে আপনার রাজ্য এবং ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করতে নয়। বরং আপনাকে দিতে এসেছি ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। আপনি দ্বিগুণ উপকৃত হবেন যদি আমাদের ধর্ম এবং জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। অন্যথায় আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে। তাহলে আমরা হব আপনার জীবন এবং সম্পত্তির জিম্মাদার। আপনাকে দেব আমরা আপনার ধর্মকর্মের স্বাধীনতা। যদি আপনি আমাদের প্রস্তাব দু'টি গ্রহণ না করেন, তবে তরবারি দ্বারাই আমাদের বিরোধের মীমাংসা হবে।'

রূমীর বক্তব্য শ্রবণ করে রডারিক বলেন- 'আমরা আপনার সন্ধির শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করছি। আমি আপনাদের প্রাণে মারব না যদি আপনারা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যান। যে সমস্ত মালামাল আপনারা হস্তগত করেছেন আমাদের শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে তা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনাদের দান করছি। আর ক্ষমা করছি, যে রক্তপাত আপনারা ঘটিয়েছেন সেই অপরাধ।' এরপর রূমী বলেন,

'আপনি আমাদের যা দিতে চাচ্ছেন সেজন্য আমাদের মহান সেনাপতির পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের দাবি পুনরায় উত্থাপন করছি। আপনাকে আমরা আবার জানাচ্ছি আমাদের দেশ থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, এক বিরাট উদ্দেশ্যে। আমাদের উদ্দেশ্য আপনার নিকট ব্যক্ত করা হয়েছে। আমাদের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের হটিয়ে দেই। আমরা আপনার যুদ্ধের প্রস্তাব গ্রহণ করছি।'

পরদিন ফজরের ছালাতের পর চূড়ান্ত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তারিক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক দিকনির্দেশনামূলক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দেন। ভাষণটি নিম্নরূপ-

'এ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার কোন পথ নেই। সম্মুখে রয়েছে শত্রু, পিছনে আছে নদী। একমাত্র আল্লাহর ওপর ঈমান এবং তার পুরস্কার পাবে এ বিশ্বাসেই আছে তোমাদের নিরাপত্তা। এই গুণাবলীর যদি অধিকারী হও, তবে তোমরা হবে অজেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যই বড় কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে ঈমান, যা নিয়ে যুদ্ধ করছ। আমাকে অনুসরণ করবে, যদি আমি আক্রমণ করি, তোমরাও আক্রমণ করবে। যদি আমি থেমে যাই, তোমরাও থামবে। আমি সেই অহংকারী অবিশ্বাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করব। যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তবে আমার মৃত্যুতে তোমরা দুঃখ করো না, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ো না। পুরুষের মত যুদ্ধ করে যেও। তোমাদের নিজকে এবং তোমাদের জাতিকে অপমানিত করো না। যদি কাপুরুষের পরিচয় দাও, তবে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে যাবে তোমাদের নাম। আর যদি সাহসের পরিচয় দিতে পার, তবে পাবে এ সমৃদ্ধ এবং ঐশ্বর্যশালিনী দেশের শাসন ক্ষমতা। মনে রেখ, যদি তোমরা জয়লাভ কর তবে তোমরা হবে গাযী আর যদি মৃত্যুবরণ কর তবে হবে শহীদ। আল্লাহ এবং তার নবী তোমাদের দেখছেন এবং তোমাদের সঙ্গে আছেন। কারণ তোমরা যুদ্ধ করছ তাদের জন্যই।'

এরপর গোয়াদিলেট নদীর তীরে উভয় বাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধ প্রায় ৭ দিন স্থায়ী হয়। এ যুদ্ধে রডারিকের কয়েকজন সৈন্য প্রথম দিকে তারিকের পক্ষ অবলম্বন করে। রডারিকের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আন্তরিকভাবে স্পেনে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দন না জানালেও মনেপ্রাণে রাজা রডারিকের পতন কামনা করত। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ শেষে গনিমতের মাল নিয়ে দেশে ফিরে যাবে এবং রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত অথবা পরাজিত হবে। এ সুযোগে তাদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করা নিরাপদ হবে। কিন্তু তাদের সে আশা চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তারিকের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে গথিক বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 'কারতাজিন্না' নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে রডারিকের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। হাজার হাজার গথ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। রাজা রডারিক প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে গিয়ে গোয়াদিলেট নদী অতিক্রমকালে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে ইতিহাসের পাতা হতে চিরবিদায় গ্রহণ করল। ইউরোপের মাটিতে মুসলিম আধিপত্যের সোপান প্রোথিত হ'ল এবং ইউরোপের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হ'ল। তারিক কয়েকদিন যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করলেন। দাফন করলেন শহীদদের লাশ এবং ঠিক করলেন পরবর্তী পরিকল্পনা। আর এভাবেই স্পেনে ইসলামের অগ্রযাত্রার সূচনা হয়।

তারিক দূত পাঠিয়ে কায়রোয়ানে অবস্থানরত সেনাপতি মূসা বিন নুসাইরকে তাঁর সাফল্যের ফলাফল ও স্পেনের অবস্থা বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। মূসা স্পেন বিজয়ের খবর শুনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। এ মহাবিজয়ের সংবাদ শুনে কায়রোয়ানে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেদিন সবচেয়ে বেশি খুশী হয়েছিলেন

মূসা। কিন্তু এ সময় মূসা তারিককে তাঁর অগ্রাভিযান স্থগিত রাখর নির্দেশ দেন। বিচক্ষণ সমরবিদ তারিক ভিজিগথদের পুনরায় সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ না দিয়ে অনতিবিলম্বে আক্রমণের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি গনিমতের মাল নিয়ে আফ্রিকায় না ফিরে রডারিকের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অবাক করে দেন এবং শহরের পর শহর দখল করেন। বিজয়দীপ্ত তারিক বাহিনী কারমোনা, সিডোনিয়া, কর্ডোভা, গ্রানাডা ও ইজিসা বা একিজা দখল করেন। এরপর মুসলিম সেনাবাহিনী পূর্ব স্পেন গমন করেন এবং রডারিকের পক্ষে থিওডোমীর শাসনাধীন সম্পূর্ণ পূর্ব স্পেন, ভ্যালেন্সিয়া ও আলমেরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা অতিদ্রুত দখল করেন। মুরসিয়ার গিরিসঙ্কটে থিওডোমীর অল্পসময়ের জন্য মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু অচিরেই মুরসিয়া ও অরিহুয়েলার পতন ঘটে।

মুরসিয়া ও অরিহুয়েলা বিজয়ের পর সেনাপতি তারিক গথ রাজধানী টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হন। মুসলিম বাহিনীর দুর্বার অগ্রাভিযানে ভীত রাজন্যবর্গ, অভিজাত শ্রেণী ও যাজকগণ রাজধানী ত্যাগ করে আস্তুরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাধারণ জনগণ ও ইহুদী সম্প্রদায় উৎফুল্লচিত্তে খ্রীস্টান ও অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক পরিত্যক্ত শহর ও নগরের শাসনভার মুসলমানদের হস্তে সমর্পণ করে। তারিক বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করেন। নগরবাসীদের সাথে তিনি অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। রাজধানী বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী প্রচুর পরিমাণে গনিমত লাভ করেন। জন্ম তারিখ, নাম, অভিষেক ও মৃত্যুর তারিখ উৎকীর্ণ করা স্বর্ণের ২৪টি রাজমুকুট এ গনিমতের মধ্যে ছিল। এগুলো গীর্জার গুপ্তস্থান হতে উদ্ধার করা হয়। এভাবে খলীফা আল-ওয়ালিদের রাজ্যসীমা সুদূর ইউরোপ ভূখণ্ড পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। তারিক তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ সামরিক বিজয়ের জন্য স্মরণীয়। গথিক শাসকদের পরাজিত করে তিনি সীমাহীন খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলমান ও তাদের মিত্রগণ দেশের উত্তরাঞ্চলে পলাতক খ্রিস্টানদের পরিত্যক্ত শহরগুলোতে বসতি স্থাপন করে। বিজিত শহরগুলোতে মুসলমান গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। এভাবে সেনাপতি তারিক মধ্য-পূর্ব স্পেন জয় করে স্পেনে মুসলিম পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হন। তারিকের শাসনাধীনে স্পেনের সাধারণ মানুষ এ আক্রমণকে তাদের কাছে আশীর্বাদরূপে গণ্য করেছিল। এখানেই সেনাপতি তারিকের সফলতার বীজমন্ত্রটি প্রোথিত।

মূসা বিন নুসাইরের স্পেন আগমন :

৭১২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে (৯৩ হিজরীর রজব মাসে) ১৮,০০০ সৈন্য নিয়ে আফ্রিকা হতে সেনাপতি মূসা বিন নুসাইর স্পেন যাত্রা করেন এবং কঙ্করময় খিদরী দ্বীপে পদার্পণ করেন। আরব অভিজাত ইয়ামেনের হাবিব বিন আবু আবাদাহ ফিহরী ইউসুফ আল-ফিহরীর পূর্বপুরুষ, রাসূল (ছাঃ)-এর সাহাবাদের বংশধর ও কিছু বার্বার সর্দার সমন্বয়ে গঠিত হয় তাঁর সেনাবাহিনী। আফ্রিকায় আগত কাউন্ট জুলিয়ানরা মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। মূসা ইচ্ছাপূর্বক তারিকের অগ্রাভিযানের পথ পরিহার করে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। প্রথমেই তিনি সিদনীয়া ও কারমোনা দখল করেন। এ দু'টি শহর তখনও পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীনে আসেনি। কয়েকমাস অবরোধের পর মূসা সেভিল অধিকার করেন। এরপরই নিয়েবলা ও বেজা বিজিত হয়। মূসা মেরিদাতে ভিজিগথদের এক শক্তিশালী সৈন্য দলের দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। দীর্ঘ এক বছর অবরোধের পর মেরিদা শহর রক্ষায় নিয়োজিত সেনাদল ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন আত্মসমর্পণ করে। বিজয়ী বেশে মূসা টলেডোর নিকটবর্তী তারাভেরাতে প্রবেশ করেন। সেখানে তারিক মূসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তৎকালীন প্রথানুযায়ী দুই বিজয়ী বীর তাঁদের মধ্যে অসি বিনিময় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই খ্যাতিমান বীরের সাক্ষাৎ আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। ঐতিহাসিকদের মতে, 'মূসা তারিককে তাঁর আদেশ অমান্য করার জন্য বেত্রাঘাত করেন *(আল-বিদায়াহ ৯/৮৩; ইবনুল আছীর, আল-কামেল ফিত তারীখ ২/৩৪৩)*।' প্রবল বিক্রমশালী বীর সেনাপতি তারিক সামরিক শৃঙ্খলার প্রতি নজিরবিহীন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নীরবে এ অপমান সহ্য করেন। তাঁর এ সীমাহীন ধৈর্য্য ও প্রজ্ঞা আমাদেরকে ওমর (রা.) ও সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, 'আবুবকর (রা.) খালিদকে ইয়ারমুক যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। যুদ্ধ চলাকালে আবুবকর (রা.)-এর ইন্তেকাল হলে ওমর (রা.) খিলাফত লাভ করেন। হিজরী ১৭ সনে ওমর (রা.) তাঁকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেন। খালিদ অবনত মস্তকে খলীফার সিদ্ধান্ত মেনে নেন এবং একজন সাধারণ সৈনিক বেশে বাকী যুদ্ধে শরীক থাকেন।' পরবর্তীতে মূসা ও তারিকের মধ্যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মূসার নামে ল্যাটিন ভাষায় স্বর্ণ মুদ্রা চালু করা হয়। এরপর তাঁরা সম্মিলিত অভিযান শুরু করেন। সম্মিলিত বাহিনী আরাগোনা আক্রমণ করলে সেখানকার শাসক কাউন্ট ফরচুন আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সারাগোসা, বার্সিলোনা, আস্তুরিকা, লিঁওন, লেগিয়া ও ক্যান্টাবেরিয়ার রাজধানী আমায়া মুসলমানদের অধিকারে আসে। উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য শহর একের পর মুসলমানদের করতলগত হয়। ফলে অনধিক দু' বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্পেন মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং উত্তরে পীরেনীজ পর্বতমালা পর্যন্ত এর সীমানা সম্প্রসারিত হয়।

মূসা পীরেনীজ পর্বতমালার অপর প্রান্তে অভিযান প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে আরো অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ফ্রান্সের অভ্যন্তরে সেনা অভিযান প্রেরণে খলীফা আল-ওয়ালিদের সমর্থন ছিল না বলে মুসলিম বাহিনী 'রোন' নদী অতিক্রম করেনি। রোন নদীর তীরে মুসলমানগণ আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি দেখতে পান। এটি ফ্রান্সের শাসক পেপিন অথবা খলীফা ওয়ালিদের দূত মুগীছ স্থাপন করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। এতে লিখিত ছিল '*ক্ষান্ত হও আর অধিক অগ্রসর হয়ো না, ইসমাঈলের সন্তানগণ প্রত্যাবর্তন কর।*' এ শিলালিপি দেখে মুসলিম সেনাবাহিনী পিছিয়ে আসে।

মূসা ও তারিকের দামেস্কে প্রত্যাবর্তন :

সেনাপতি মূসা ও তারিক যখন ফ্রান্স সীমান্ত থেকে দক্ষিণ ইউরোপ বিজয়ের পরিকল্পনা করছিলেন ঠিক তখনই রাজধানী দামেস্কে প্রত্যাবর্তনের জন্য খলীফা ওয়ালিদের জরুরী নির্দেশ লাভ করেন। ৭১৩ খ্রীস্টাব্দে তারা স্পেন ত্যাগ করে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। স্পেনে তাঁদের অবস্থানকাল যথাক্রমে ২ বছর ৪ মাস ৩ বছর ৪ মাস ছিল। স্পেন ত্যাগের পূর্বে মূসা সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র আবদুল আযীয উত্তর আফ্রিকার ভাইসরয়ের অধীনে স্পেনের গভর্ণর নিযুক্ত হন। তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় সেভিলে। অপর পুত্র বীর যোদ্ধা আবদুল্লাহকে ইফ্রিকিয়ার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল মালিক মরক্কোর শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঞ্জিয়ারকে সদর দফতর করে আবদুস সালেহ উপকূল রক্ষা ও নৌবাহিনীর দায়িত্ব পালন করেন। এরূপে নববিজিত সাম্রাজ্যের শাসনভার যোগ্য হস্তে ন্যস্ত করে হিজরী ৯৬ সনে মূসা ও তারিক স্পেন ত্যাগ করেন। বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পত্তি নিয়ে তারা সগৌরবে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, বারিধারা ক্যাম্পাস, ঢাকা।

হিজরী সনের পরিচিতি

আব্দুর রশীদ

মানবসমাজে দিন-ক্ষণ গণনার প্রচলন বহু প্রাচীন। তখন সূর্য ও চন্দ্রের উদয়-অস্তের উপর নির্ভর করে মানুষ দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করত। দিন-ক্ষণ গণনার জন্য সমাজের গণক-জ্যোতিষীরা মোটামুটি একটা নীতিমালাও তৈরী করেছিল। তবে আধুনিক বর্ষপঞ্জীর মত স্থায়ী, সুশৃংখল কাঠামোবদ্ধ ছিল না সেসব গণনাপদ্ধতি। ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবরা চন্দ্রের হিসাবে দিন-ক্ষণ গণনায় অভ্যস্ত ছিল। ইসলামের আগমনের পরও এ ধারার ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে কুরাইশরা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য ইহুদীদের কূট পরামর্শে চন্দ্রমাসের হিসাবে যে গরমিল করেছিল, তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ১০ম হিজরীতে আয়াত নাযিল করেন, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র কাছে মাস গণনায় মাস-বারটি (তেরটি নয়)। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না' *(তাওবাহ ৩৬)*। ফলে হিজরী ১৭ সালে ওমর (রাঃ)-এর আমলে ইসলামী বর্ষপঞ্জী বা হিজরী সন প্রবর্তিত হবার আগ পর্যন্ত মুসলমানরা সঠিক নিয়ম মোতাবেকই চন্দ্রবর্ষ মোতাবেক সন গণনা করত।

হিজরী সন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সন। যার প্রতিটি দিন, মাস ও বর্ষ চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। মুসলমানদের মৌলিক ইবাদতসমূহ চাঁদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এর উদয়-অস্তের উপর ভিত্তি করেই রামাযানের আগমন, ঈদ উদযাপন, লাইলাতুল ক্বদর, হজ্জ ও কুরবানীসহ নানাবিধ ইবাদত-বন্দেগীর সময় নির্ধারিত হয়। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র সুদৃঢ় ভিত্তি লাভের পর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য, সর্বোপরি চন্দ্রমাসের বিশেষ বিশেষ দিবস ও রজনী মুসলিম জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণে একটি নির্ভুল দিনপঞ্জিকার আবশ্যকতা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে 'হিজরী' নামক এই গুরুত্বপূর্ণ সনের জন্ম হয়। নিম্নে হিজরী সনের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল।

হিজরী সন প্রবর্তনের পেক্ষাপট :

হিজরী সন প্রবর্তনের পূর্বে তৎকালীন আরববাসীরা সরকারী কিছু চিঠি-পত্র ও অফিসিয়াল কাগজ-পত্র ছাড়া সাধারণ চিঠি-পত্র ও দলীলপত্রে সন, মাস, দিন বা তারিখ লেখার প্রয়োজন মনে করতেন না। কারণ, তারা পত্র লেখার পরে কিংবা পত্র প্রাপ্তির পরে প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে তা সংরক্ষণ না করে ছিঁড়ে ফেলতেন।

ঐতিহাসিক বর্ণনামতে, খলীফ আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ইয়ামানের গভর্নর ইয়ালাব বিন উমাইয়া সর্বপ্রথম হিজরী তারিখ ব্যবহার করেন। তবে ওমর (রাঃ)-এর আমলে সর্বপ্রথম হিজরী সন গণনা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পায়।

খলীফা ওমর (রাঃ) একদিন আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর কাছে দিন-তারিখ বিহীন একটি পত্র লিখেছিলেন। প্রত্যুত্তরে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) পত্র মারফত তাঁকে তারিখবিহীন পত্রের বিষয়টি অবগত করলে তিনি তা গুরুত্ব সহকারে আমলে নেন। এমনিভাবে হিজরী ১৬ সালে ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কাছে একটি দলীল পেশ করা হয়, যেটাতে কোন সাল ও তারিখ ছাড়াই শুধু শাবান মাসের নাম উল্লেখ ছিল। এটা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, দলীল-পত্রে উল্লেখিত শাবান মাস চলতি বছরের না-কি গত বছরের তা কিভাবে বোঝা যাবে? ফলে বিষয়টি আরো জটিল সমস্যার রূপ ধারণ করে। এমনি এক পরিস্থিতিতে ১৭শ হিজরী সনে ওমর (রাঃ) মজলিসে শূরা আহ্বান করেন এবং উক্ত সমস্যা নিরসনের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ কামনা করেন।

হিজরী সনের প্রবর্তন ও নামকরণ :

নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ১৭শ হিজরী সনে (কারো মতে ১৬ বা ১৮ হিজরীতে) ওমর ফারূক (রাঃ) কর্তৃক মজলিসে শূরা আহ্বানের পর কেউ কেউ রোমান আবার কেউ ইরানী সন গ্রহণের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। তবে অধিকাংশ ছাহাবীই নতুন স্বতন্ত্র ইসলামী সন প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন। আলোচনা শেষে রোমান ও ইরানী সালের (কারণ এদু'টি মাস চন্দ্রমাসের ভিত্তিতে গণনা করা হত) অনুকরণ করে নতুন ইসলামী সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা প্রণয়নের জন্য জ্যোতিষবিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান ও পারসিক সাল গণনায় পারদর্শী প্রাক্তন খুজিস্তানের অধিপতি নওমুসলিম হরমুজানকে সাদরে আহ্বান করা হয়। তার প্রণীত ও নবোদ্ভাবিত সন-তারিখ মজলিসে শূরার অনুমোদনসাপেক্ষে গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কিন্তু নব প্রবর্তিত ইসলামী সালের নাম ও ক্ষণ কখন থেকে গণনা করা শুরু হবে–এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম সাল ও তারিখ হতে আবার কেউ তাঁর মৃত্যু তারিখ হতে গণনা শুরু করার পরামর্শ দেন। অবশেষে আলী (রাঃ) মদীনায় হিজরতের কারণে মহানবী (ছাঃ)-এর মহাসাফল্যের কথা উল্লেখ করে হিজরতের দিন (২২শে রবীউল আউয়াল/২৪শে সেপ্টেম্বর ৬২২ইং) হতে হিজরী সাল গণনার প্রস্তাব দেন। অবশেষে ওমর ফারুক (রাঃ) শূরা সদস্য ও ছাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে আলী (রাঃ)-এর অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে হিজরতের দিন থেকে 'হিজরী সাল' প্রবর্তনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী 'রবীউল আওয়াল' মাস থেকে হিজরী বর্ষ শুরু করার কথা ছিল। কেননা এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের মাস। কিন্তু প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী 'মুহাররাম' মাসকেই বছরের প্রারম্ভিক মাস করার জন্য ওছমান (রাঃ) পরামর্শ দেন। তাই আরো দু'মাস সংযুক্ত করে হিজরতের ২ মাস ৮ দিন পূর্ব হতে হিজরী সন গণনা শুরু হয়। সেই হিসাবে হিজরী সনের প্রথম দিনটি ছিল ইংরেজী বর্ষপঞ্জিকার ১৬ই জুলাই ৬২২ খৃষ্টাব্দ।

হিজরী মাস সমূহের নামকরণ :

অন্যান্য বর্ষের ন্যায় হিজরী বর্ষের মাসসমূহ ১২টি। যা পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন হতে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত *(সূরা তওবা ৩৬)*। এ সকল মাসসমূহকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। যথা:– মুহাররম,

ছফর, রবীউল আউয়াল, রবীউল আখের, জুমাদিউল উলা জুমাদিউল আখেরাহ, রজব, শা'বান, রামাযান, শাওয়াল, যিলক্বদ, যিলহজ্জ। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের বহুযুগ পূর্ব হতে মাসের নামগুলো এরূপভাবে চলে আসছে। কথিত আছে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের ১৫০ বছর পূর্বে কিলাব বিন মুরারার নেতৃত্বে হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের বৈঠকে উক্ত নামগুলি নির্ধারণ করা হয়েছিল। যে যুগ ছিল অন্ধবিশ্বাসী আরবগণ কর্তৃক শতশত দেব-দেবী ও মূর্তিপূজায় তিমিরাচ্ছাদিত। এতদসত্ত্বেও মাসের নামগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় কোন দেব-দেবী বা মূর্তির নামে এদের নামকরণ করা হয়নি। বরং নামকরণের পিছনে আরবীয় মৌসূমী কিছু প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভূমিকা রেখেছে। হয়তবা এ কারণেই হিজরী ১৭তম বর্ষে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে হিজরী সন গণনা শুরু হলেও মাসের প্রাক্তন নামকরণকে স্বাগত জানানো হয়, এতে কোনরূপ পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়েনি। মাসগুলির নামের অর্থ

এবং নামকরণের কারণ নিম্নে আলোচিত হল–

(১) মুহাররম : হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররম। যা প্রাচীন আরবে 'সফর উলা' নামে পরিচিত ছিল। মুহাররম (محـرم) শব্দটি আরবী হারমুন (حرم) ধাতু হতে উদ্গত। যার অর্থ মর্যাদাসম্পন্ন বা সম্মানিত। বিশেষতঃ এ মাসের ১০ তারিখ (আশূরা) ও অন্যান্য তারিখে অতীতের বহু নবী-রাসূল দাওয়াতী জীবনে প্রাণঘাতী সমস্যা কাটিয়ে উঠেছিলেন। যেমন মূসা (আঃ) ফেরাউন থেকে, ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদী হুতাশন, ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে মুক্তিলাভ, দাউদ (আঃ) তার বিদ্রোহী পুত্র ও কাবাগৃহ আবরাহার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ায় এ মাসকে নিস্কৃতি বা পরিত্রাণের মাস হিসাবে সম্মানিত করা হয়েছে। তাছাড়া চারটি 'নিষিদ্ধ' মাসের অন্যতম মাস হিসাবে সম্মান প্রদর্শনার্থে আরববাসীরা এ মাসে যাবতীয় যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকত। তাই এ মাসকে 'মুহাররম' বা সম্মানিত বলা হয়ে থাকে।

(২) সফর : এ মাসটিকে পূর্বে 'সফর আখেরাহ' বলা হত। পরে 'সফর উলা' 'মুহাররম' নামের সাথে পরিবর্তিত হওয়ায় 'সফর আখিরাহ'কে শুধু 'সফর' নামকরণ করা হয়। 'صفر' এর আভিধানিক অর্থ শূন্য, খালি বা হরিদ্রা বর্ণ। এ মাসে সাধারণতঃ আরববাসীদের ঘর-বাড়ি খালি বা শূন্য থাকত। কারণ তারা এ মাসটি ভ্রমণে কাটিয়ে দিত অথবা যুদ্ধে নামত এবং বনভূমিতে শক্তিপরীক্ষা করতে যেত। তারা আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীর জনপদ ও সবুজ বাগ-বাগিচা ধ্বংস করত, ফসলাদি নষ্ট করত, সন্তান হত্যা করে মায়ের বুক খালি করত। এসব কারণেই এ মাসের নাম শূন্য, খালি বা সফর মাস রাখা হয়েছে। কারো মতে, আরবদের নিকট হেমন্তকাল ছিল বিশেষ মাস। হেমন্ত কালে সাধারণত বৃক্ষের পাতা হলুদ বর্ণ হয়ে থাকে। তাই মৌসূমী প্রভাবের কারণে এ মাসকে সফর বা হরিদ্রা বর্ণের মাস নামে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে আরববাসীরা ধারণা করত, এ মাস এলেই তাদের উপর কোন না কোন বিপদাপদ চেপে বসবে। তাই তারা এক কুলক্ষণের মাস বলে খুব ঘৃণা করত। তাদের এ কুধারণার মূলোৎপাটনকল্পে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেন, 'ছোঁয়াচে রোগ, কুলক্ষণ, পেঁচার ডাক এবং সফর মাসে অশুভ বলে কিছুই নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৭৮-৮০)*।

(৩) রবীউল আউয়াল ও (৪) রবীউল আখের বা রবীউছ ছানী : আরামীয় ভাষার শব্দ রবী' (ربيــع)-এর অর্থ, বসন্তকালের ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, সঞ্জীবনী বা সবুজের সমারোহ। 'রবী' বলতে বসন্তকালের মৃদু-মন্দ বৃষ্টিধারায় জন্মানো সবুজ বৃক্ষ-লতার সঞ্জীবনী সুধার মাস বুঝায়। মরুভূমির দেশে এই দুস্প্রাপ্য প্রায় বৃষ্টির আগমনে আরববাসীর হৃদয়-মন সবুজ বৃক্ষ-লতার মত সঞ্জীবিত-সবুজাভ হয়ে উঠত।

কারো মতে, প্রতিশোধপরায়ণ আরববাসীরা সফর মাসে অন্য গোত্র থেকে যে সমস্ত ধন-সম্পদ লুটতরাজ করে বা জোরপূর্বক ছিনিয়ে আনত, 'সফর' কুলক্ষণী মাস হওয়ায় তা ভাগ-বাটোয়ারা না করে গোত্র প্রধানদের নিকট গচ্ছিত রাখত। অতঃপর রবী' বা মৃদু-মন্দ বৃষ্টির মাসে নির্ধারিত পন্থায় তা ভাগ করত। এই গচ্ছিত সম্পদ হাতে পেয়ে তারা মৃদু-মন্দ বৃষ্টির ধারায় আবেগাপ্লুত হওয়ার ন্যায় খুশিতে পুলকিত হত। সে কারণে এ মাসের নাম রবী' রাখা হয়।

আল্লামা ইবনে কাছীরের মতে, এ মাস দু'টিতে আরবরা তাদের বাড়ীতেই অবস্থান করত। আর অবস্থান করাকে আরবীতে ربيــع বলা হয়। তাই একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

(৫) জুমাদাল উলা ও (৬) জুমাদাল আখেরাহ বা জুমাদাছ ছানিয়াহ : 'জুমাদা' শব্দটি 'جمد' থেকে উদ্গত। এর অর্থ জমাট বাঁধা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। যে সময় এ মাস দু'টির নামকরণ করা হয়, সে সময় এ দু'টি মাস এমন সময় আসত যে, বৃষ্টির অভাবে মাটি অত্যধিক কঠোর ও শুষ্ক হয়ে যেত। তখন মাটি হতে কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারত না এবং জমাট বাঁধা পাথরের মত শক্ত হয়ে যেত। সেজন্য এ মাসের নাম 'জুমাদা' রাখা হয়।

(৭) রজব : রজব শব্দটি رجب শব্দ থেকে গৃহীত। অর্থ সম্মানিত। এই মাসটি মর্যাদাপূর্ণ মাস বলে একে রজব বলা হয়। ইসলামপূর্ব যুগে এই সম্মানিত মাসে লুটতরাজ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-খারাবি ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। তৎকালীন আরববাসীরা এ মাসেই হজ্জ ও উমরা পালন করত। 'মুযার' নামক প্রবল প্রভাবশালী একটি গোত্র এ মাসের প্রতি অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যাবতীয় রক্তপাত, লুটতরাজ ইত্যাদি অন্যায় কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকত। এই বিশেষ কারণে আরবগণ এক 'রজবে মুযার' বলে আখ্যায়িত করত। ইসলামও এ মাসটিকে 'আশহুরুল হুরুম' বা 'নিষিদ্ধ মাসসমূহের অন্যতম মাস' বলে ঘোষণা করেছে।

(৮) শা'বান : 'شعبان' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পৃথকীকরণ। এ মাসে আরববাসীরা খাদ্য ও পানির খোঁজে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে নানা স্থানে ঘুরাফেরা করত। লুটপাট করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে এদিক- ওদিক ছড়িয়ে পড়ত। এ মাস তাদের জীবনকে বর্হির্মুখী করে তুলত। তাই এ মাসের নাম 'শা'বান' রাখা হয়। সাইয়্যেদ আমীর আলী বলেন, 'শা'বান' অর্থ বৃক্ষলতাদি মুকুরিত হবার মাস। সম্ভবত যে মওসুমে বা আবহাওয়ায় এই মাসটির নাম রাখা হয় তখন আরবে বৃক্ষ ও ফলমূলের গাছ মুকুরিত হতো। তাই একে 'শা'বান' নামকরণ করা হয়েছে।

(৯) রামাযান : 'রামাযান' আরবী শব্দ 'رمض' মূলধাতু থেকে উদ্গত। এর অর্থ পুড়িয়ে ফেলা, জ্বালানো বা ভস্মীভূত করা। নামকরণের সময় এ মাস ভীষণ গরমকালে আরম্ভ হত। লু-হাওয়া প্রবাহিত হত। মানুষ ও জীব-জানোয়ার পানিশূন্য মরুময় আরবে গরমের দরুন ছটফট করত। উটের পা পুড়ে যেত। হাওয়া যেন আগুনের ফুলকি মনে হত। এ সব মৌসুমী কারণেই এ মাসের নামকরণ করা হয় রামাযান। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রামাযান মাসে একটানা ছিয়াম সাধনার ফলে মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ পাপরাশি ধ্বংস করা হয় বা জৈব প্রবৃত্তিকে ক্ষুৎ-

পিপাসার আগুনের জ্বালিয়ে দুর্বল করে ফেলা হয় বলে এ মাসটিকে 'রামাযান' মাস বলা হয়েছে।

(১০) শাওয়াল : شـــوال শব্দটি 'شـــول' মাসদার থেকে উদ্গত। অর্থ উত্তোলিত হওয়া, উত্তোলন করা বা বহন করা ইত্যাদি। এ মাসে উটনী বাচ্চা প্রসব করত এবং লেজ পিঠে করে রাখত। এ জন্যেই এই মাসের নাম হয়ে যায় শাওয়াল। কারো মতে, শব্দটি 'شائلة' ধাতু থেকে উদ্গত। যার অর্থ, ৭/৮ বছরের দুগ্ধহীন উষ্ট্র। প্রাক-ইসলামী যুগে এ মাসের নামকরণের সময় সম্ভবত: সবুজ ঘাসের অভাবজনিত কারণে উষ্ট্রের দুগ্ধ হত না, শুকিয়ে যেত। তাই একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

(১১) যুলক্বা'দাহ : যুলক্বা'দাহ আরবী শব্দ। এটি (قعــد) ধাতু থেকে উৎসারিত। অর্থ বসা, অবস্থান করা, উপবেশন করা, নড়াচড়া না করা ইত্যাদি। সুতরাং 'যুলক্বা'দাহ' অর্থ বসে থাকার মাস, অবস্থান করার মাস। এ মাসটিও নিষিদ্ধ মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য আরবের লোকেরা এ মাসে বাড়ীতে বসে থাকত। তারা যুদ্ধের জন্যেও বের হত না এবং সফরের উদ্দেশ্যেও যাত্রা শুরু করত না। যুদ্ধ চলমান থাকলে মুলতবি ঘোষণা করত। তাই এ মাসকে 'যুলক্বা'দাহ' নামকরণ করা হয়েছে।

(১২) যুলহিজ্জাহ : আরবী মাসের সর্বশেষ মাসের নাম যুলহিজ্জাহ বা যিলহজ্জ। এটি একটি ঐতিহাসিক নাম। প্রাক-ইসলামী যুগ হতে এ মাসে হজ্জব্রত পালিত হত বলেই এর নামকরণ করা হয় যিলহজ্জ।

আরবীতে সাপ্তাহিক দিনগুলির নাম ও নামকরণের কারণ :

ঐতিহাসিক আল-বেরূনীর মতে, প্রাচীন আরবে সপ্তাহের ধারাবাহিক নামগুলো প্রচলিত ছিল এরূপ-শিয়ার, আওয়াল, আহ্ওয়ান, জুবার, দুবার, মু'নিস এবং উরূবা। প্রাচীন আরব কবিদের কবিতার মধ্যে এ নামগুলোর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে আধুনিক হিজরী সনের সাপ্তাহিক দিনগুলিতে এগুলির কোন অস্তিত্ব নেই। বরং সপ্তাহের দিনগুলির আধুনিক আরবী নাম হল-

১. يوم الســبت (ইয়াউমুস সাবত)-শনিবার। 'ইয়াউম' অর্থ দিন এবং 'সাবত' অর্থ বিশ্রাম গ্রহণ করা। অর্থাৎ এর অর্থ দাঁড়ায় 'বিশ্রামের দিন'। হিব্রু শব্দ 'সাব্বাত/সাভাত' থেকে 'সাবত' শব্দটি গৃহীত হয়েছে। ইহুদীদের বিশ্বাসমতে, ঈশ্বর ৬ দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টির পর ৭ম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এজন্য ইশ্বরের সম্মানার্থে তারাও এ দিনটি বিশ্রামের দিন হিসাবে গ্রহণ করে *(বাইবেল, এক্সোডস ২০/৮-১১)*।

২. يوم الأحد (ইয়াউমুল আহাদ)-রবিবার। 'আহাদ' অর্থ এক। অর্থাৎ বিশ্রামের পর সপ্তাহের ১ম দিন।

৩. يوم الإثــنين (ইয়াউমুল ইছনাইন)-সোমবার। 'ইছনাইন' অর্থ দুই। অর্থাৎ সপ্তাহের ২য় দিন।

৪. يــوم الثلثــاء (ইয়াউমুল ছুলাছা)-মঙ্গলবার। 'ছুলাছা' অর্থ তিন। অর্থাৎ সপ্তাহের ৩য় দিন।

৫. يوم الأربعاء (ইয়াউমুল আরবি'আ)-বুধবার। 'আরবি'আ' অর্থ চার। অর্থাৎ সপ্তাহের ৪র্থ দিন।

৬. يوم الخميس (ইয়াউমুল খামীস)-বৃহস্পতিবার। 'খামীস' অর্থ পাঁচ। অর্থাৎ সপ্তাহের ৫ম দিন।

৭. يوم الجمعــة (ইয়াউমুল জুম'আ)-শুক্রবার। 'জুম'আ' অর্থ একত্রিত হওয়া। অর্থাৎ জুম'আর ছালাতে একত্রিত হওয়ার দিন।

আধুনিক কালে চান্দ্রবর্ষের হিসাব :

চন্দ্রমাসের হিসাবে প্রতিটি দিন গণনা শুরু হয় মাগরিব তথা সূর্যাস্তের পর থেকে পরবর্তী দিন সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। আর প্রতিটি চান্দ্রমাস সমাপ্ত হয় ২৯ দিন ১২/১৩ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে। একে সাধারণভাবে ২৯ ও ৩০ দিনে গণনা করা হয়। ওমর (রাঃ)-এর সময়ের এই গণনা নির্ভুলভাবে অদ্যাবধি মুসলিম জাহানে প্রচলিত আছে। প্রতিটি চান্দ্রবর্ষ সমাপ্ত হয় ৩৫৪ ঘণ্টা ৮/২০ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ডে। তাই হিজরী বর্ষকে সাধারণভাবে ৩৫৪ দিনে ধরা হয়। সেই হিসাবে সৌরবর্ষ থেকে চান্দ্রবর্ষ প্রতিবছর ১১ দিন করে ছোট হতে থাকে। এভাবে ৩৩টি চান্দ্রবর্ষ ৩২টি সৌরবর্ষের সমান হয়। আর প্রতি বছর থেকে অবশিষ্ট ৮/৯ ঘণ্টাকে কয়েকবছর পর পর সমন্বয় করতে হয়। এজন্য সৌরবছরের ন্যায় হিজরী সনেও অধিবর্ষ (Leap year) রয়েছে। প্রতি ৩০ বছরে ১১টি অধিবর্ষ ও ১৯টি সাধারণ বর্ষ থাকে। অধিবর্ষগুলো ৩৫৫ দিনে ধরা হয়। সাধারণভাবে দু'টি চন্দ্রমাস ৫৯ দিনে শেষ হয়। এজন্য ধারাবাহিকভাবে এক মাস ৩০ দিনে এবং পরবর্তী মাস ২৯ দিনে সমাপ্ত হয়। এ হিসাব অনুযায়ী চন্দ্রমাসের ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম, ১০ম ও দ্বাদশতম মাস ২৯ দিনে হয়।

হিযরী সনকে খৃষ্টাব্দে রূপান্তর করার নিয়ম :

হিজরী সনকে খৃষ্টাব্দে বা খৃষ্টাব্দকে হিজরী সনে রূপান্তরের জন্য বর্তমানে ডিজিটাল ক্যালকুলেটর রয়েছে। তবে হাতে হাতে হিসাব করতে চাইলে নিম্নোক্তভাবে করা যায়।

১ম ধাপ : প্রথমে হিজরী সনকে ৩৩ দিয়ে ভাগ করে শুধু ভাগফলটি গ্রহণ করুন *(ভাগশেষের চিন্তা বাদ রাখুন)*।

২য় ধাপ : এরপর হিজরী সন থেকে ভাগফলটি বিয়োগ করুন।

৩য় ধাপ : সবশেষে বিয়োগফলের সাথে ৬২২ (হিজরতের বর্ষ) যোগ করুন। সর্বশেষ এই যোগফলটিই হবে কাংখিত ফল।

উদাহরণ : ১৪৩৫ হিজরীতে খৃষ্টাব্দ সন কত হবে?

উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী- ক) ১৪৩৫÷৩৩ = ৪৩ *(এখানে ১৬ ভাগশেষ, যা ধর্তব্য নয়)*। খ) ১৪৩৫-৪৩=১৩৯২। গ) ১৩৯২+৬২২=২০১৪। এটিই হল কাংখিত খৃষ্টাব্দ। একই নিয়মে পূর্বের সালও বের করা যাবে।

খৃষ্টাব্দকে হিজরী সনে রূপান্তর করার নিয়ম :

১ম ধাপ : প্রথমে ইংরেজী সাল হতে ৬২২ (হিযরতের বর্ষ) বিয়োগ করে বিয়োগফলকে শতাব্দী ও অশতাব্দী নামক দু'টি অংশে বিভক্ত করতে হবে।

২য় ধাপ : এরপর শতাব্দী অংশকে ৩ দিয়ে গুণ করতে হবে।

৩য় ধাপ : আর অশতাব্দী অংশ ০০-৩৩ এর মধ্যবর্তী হলে ১, ৩৩-৬৬ এর মধ্যবর্তী হলে ২ এবং ৬৬-৯৯ এর মধ্যবর্তী হলে ৩ যোগ করতে হবে।

৪র্থ ধাপ : ইংরেজী সাল হতে ৬২২ বিয়োগ করলে বিয়োগফল যদি ১০০০ বা তার বেশী হয় তবে আরো ১ যোগ করুন। সর্বমোট যোগফলটিই হবে হিজরী সাল।

উদাহরণ : ২০১৩ সালে হিজরী সাল কত হবে?

উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী- ক) ২০১৩-৬২২=১৩৯১ (হিজরতের বর্ষ বিয়োগ করে)। খ) ১৩×৩=৩৯ (শতাব্দী অংশ ১৩ গুণন ৩)। গ) অশতাব্দী অংশ ৯০ হওয়ায় যোগ হবে=৩। ঘ) বিয়োগফল ১৩৯১ হওয়ায় যোগ হবে=১। সর্বমোট যোগফল= ১৪৩৪ (১৩৯১+৩৯+৩+১)। এ ফলটিই কাংখিত হিজরী সাল।

সূত্র :

১. তাফসীর ইবনে কাছীর।
২. মুহাম্মাদ সগীর উদ্দীন মিঞা, চন্দ্রমাসের ইতিকথা।
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ।

লেখক : সহ-পরিচালক, সোনামণি।

নতুন অভিযাত্রার প্রারম্ভে

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রায্যাক

জ্ঞানার্জনের মূলত ২টি পথ। একটি বই পাঠের মাধ্যমে দ্বিতীয়টি চলার পথে অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আসে। আর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার ঝুলি সফরের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের প্রায় ১৪টি স্থানে সফরের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন যেমন– আনকাবূত ২০, ফাতির ৪৪, নাহল ৩৬, নমল ৬৯, রূম ৪২, মুহাম্মাদ ১০ প্রভৃতি। সম্প্রতি আমার ভারতে আসার পিছনে মূলত জ্ঞানার্জনের এই দু'টি পথকে একত্রে গ্রথিত করার একটা প্রয়াস ছিল। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ভারত একটি পরিচিত নাম। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, সম্রাট জাহাঙ্গীর, আলমগীর, শাজাহান, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অগণিত মহান আলেম-ওলামা, রাজা-বাদশাহ ও পণ্ডিতদের নাম ছোট থেকে কত শুনে আসছি। তাঁদের জন্মভূমি, পদচারণাস্থল ভারত যাওয়ার ইমেজ একটু আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। ২৩টি প্রদেশে বিভক্ত এই বিশাল দেশটি সামরিক, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, খেলাধূলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছে। এমন একটি দেশ সফরে যাওয়ার পিছনে মূলত ২টি উদ্দেশ্য কাজ করছিল–

১. উত্তর দিনাজপুরে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয়। ২. উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা। ইতিমধ্যে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেছি। কিন্তু আমার একান্ত আগ্রহ বিদেশে পড়াশোনা। আমার বাপ-চাচারাও এদেশে পড়াশোনা করে গেছেন। আমার আগ্রহ দেখে আব্বুও রাজি হলেন। সবমিলিয়ে দিন-ক্ষণ ঠিক করে ভারত গমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। পাসপোর্ট-ভিসার সকল প্রকার কাজ সম্পন্ন করে ১লা আগষ্ট ২০১১ বা'দ ফজর আমরা সপরিবারে চাপাইনবাবগঞ্জ বর্ডারের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ি।

মুসলিম দেশের একজন নাগরিকের এই কি অধিকার? : সোনা মসজিদ কাস্টমস অফিসে পৌঁছার পর নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক পাসপোর্টধারীর ছবি ও চেহারা মিলিয়ে নিচ্ছে দায়িত্ব পালনরত অফিসার। এক পর্যায়ে বোরকা পরিহিতা আমার আম্মাকে নেকাব খুলতে বললে তিনি অস্বীকার করেন। এই নিয়ে বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে যায়। কাস্টমস অফিসার বললেন, 'কুরআন হাদীছে কোথাও মুখ ঢাকার কথা নেই। নেকাব না খুললে আপনাকে ব্লাক-মার্কেটিং-এর অভিযোগে হয় জেলে পাঠাবো আর না হয় আপনার ভিসা বাতিল করা হবে'। জবাবে আম্মা বললেন, 'আমি এদেশের স্বাধীন নাগরিক। নেকাব খোলা বা না খোলা এটা আমার ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত ব্যাপার। এতে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এটা মানবাধিকার লংঘন। তবে হ্যাঁ, আপনাদের এখানে কোন মহিলা অফিসার থাকলে নেকাব খুলতাম। যেহেতু নেই, সেহেতু খোলা সম্ভব নয়। আপনারা ভিসা বাতিল করেন বা থানায় নিয়ে যান তাতে আমার আপত্তি নেই।' আম্মার দৃঢ়তা দেখে অফিসারটি ব্যঙ্গ করে বলল, 'ঠিক আছে, আমরা না হয় ছেড়ে দেব, কিন্তু ভারতের কাস্টমস অফিস কিন্তু মুখে ছাই দিয়ে মুখ খুলবে।' ভারতের কাস্টমস অফিসে একই অবস্থার সৃষ্টি হ'লে আমরা ভাবলাম হিন্দু দেশ, পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আরো কঠিন হবে। কিন্তু আমাদের আশ্চর্য করে দিয়ে তারা জবাব দিল 'ঠিক আছে নেকাব যখন খুলবেন না, আমরা আপনার ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত দিতে চাইনা, আপনি যেতে পারেন।' মুসলিম নামধারী আমাদের এ সমস্ত দুর্মুখদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক!

রক্তের টান : চাপাইনবাবগঞ্জ বর্ডার থেকে মালদা রেলস্টেশন এবং সেখান থেকে ট্রেনযোগে আমরা উত্তর দিনাজপুরে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং রাত ৮টার দিকে সেখানে পৌঁছে গেলাম। রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় বলতে আমরা আমাদের দুই দাদার ছেলে-মেয়েদের জানতাম। তবে ছোট থেকেই দাদা-দাদীর মুখে ঐ দেশে বসবাসরত আমাদের আত্মীয়দের গল্প শুনতাম। আমাদের সাথে ইতিপূর্বে তাদের কোন প্রকার সাক্ষাত হয়নি। কিন্তু আমাদের নিয়ে তাদের উৎসাহ-আনন্দ, স্নেহ-সম্মান, আর বিদায়ের বেলায় তাদের অঝোর ধারায় কান্না দেখে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম কাকে বলে রক্তের বাঁধন।

শায়খ আব্দুল মতীন সালাফীর মাদরাসা পরিদর্শন : দ্বীনের সেবায় তাঁর অবদান মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুখে বহুদিনের শোনা। তাই খুব আগ্রহ নিয়ে ৩ আগস্ট'১১ শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী সাহেবের মাদরাসায় গেলাম। ৫০০ ছেলে ও ১০০০ মেয়ে নিয়ে আলাদা আলাদা বিল্ডিংয়ে পাঠদানের সুব্যবস্থাসম্পন্ন একটি বড় মাদরাসা। এখানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি IT কলেজও আছে। মাদরাসা থেকে প্রতিবছর ছাত্ররা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী সাহেবের মৃত্যুর পর এই ৩টি প্রতিষ্ঠান ও এগুলোর সম্পত্তির কর্তৃত্ব নিয়ে তাঁর সন্তান ও ভাইদের মনোমালিন্যে মাদরাসার পরিবেশ কিছুটা খারাপ হ'লেও শায়খের সুযোগ্য সন্তান মতীউর রহমান মাদানীর কর্মতৎপরতায় তা কাটিয়ে উঠবে আশা করা যায়। আব্বুর পরিচয় জানতে পেরে তারা খুবই আন্তরিকতা দেখায় এবং বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কার্যক্রম ও গালিব স্যার সম্পর্কে জানতে চায়।

দার্জিলিং, ভয় ও আনন্দের মিশেলে একদিন : কিষাণগঞ্জ–শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিং। বড় বড় নাম না জানা হাজারো সবুজ গাছে ঘেরা উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বত, ঝর্না বেয়ে ছুটে আসা পানির শাঁ শাঁ শব্দ, জনমানবহীন নির্জন রাস্তা, চোখের পলকে পার হয়ে যাওয়া দু-একটি গাড়ী ছাড়া নির্জন পাহাড়ী বনের রাস্তায় চোখে পড়ার মত কিছু নেই। আশ-পাশের প্রকৃতিকে কেন যেন আমাদের শত্রু মনে হ'তে লাগল। দুপুর ১টার সময়ও ঘন ছায়ার কারণে সূর্যি মামার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছেনা। বুঝলাম এখানে সারাটা দিনই সন্ধ্যার মত আবছা আবছা অন্ধকার বিরাজ করে। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে উপরের দিকে উঠতে উঠতে এত উপরে চলে আসলাম যে, একদিকে শত শত ফিট উচুঁ পাহাড় অন্য দিকে শত শত ফুট নিচু খাঁদ। ড্রাইভারের বিন্দুমাত্র অসচেতনতায় ঘটে যেতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। কোন কোন পাহাড়ের উচ্চতা দেখে মনে হচ্ছিল এটাই হয়তোবা সর্বোচ্চ পাহাড়। কিন্তু আমাদের এই ধারণা বারবার ভুল প্রমাণিত হ'তে লাগল। প্রতিটি পাহাড়ে পৌঁছার পর তার চেয়ে দ্বিগুণ উচ্চতার পাহাড় চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এক পর্যায়ে হতাশ হয়ে সবচেয়ে বড় পাহাড় নির্বাচন করার দায়িত্ব ছোট ভাইদের কাঁধে অর্পণ করে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম আর বলতে লাগলাম سبحان الله وبحمده। সবাই মিলে উপরে উঠার দো'আ পড়ছিলাম الله اكبر।

এক সময় গাড়ি মেঘের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। চারিদিকে কুয়াশার মত। হেডলাইট জ্বালিয়েও রাস্তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ তখন দুপুর ১টা। উপরে উঠতে উঠতে এক পর্যায়ে মেঘকে আমাদের গাড়ি থেকে নিচে ঘূর্ণায়মান দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা অনুভূত হতে লাগল। দার্জিলিং-এর অধিবাসীদের আমরা মাফলার, জ্যাকেট, মোজা পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। অথচ এর ৫/৬ ঘণ্টা পূর্বে পশ্চিম বাংলায় খালি গায়ে ফ্যান চালিয়েও থাকা মুশকিল ছিল। তাও আবার এখন ভরদুপুর। সেখানে গিয়ে আমরা একটি মসজিদে উঠলাম। দার্জিলিং-এ মোট ৩টি মসজিদ ও ২টি মাদরাসা রয়েছে। সেখানে একজন নওমুসলিম আহলেহাদীছ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ফিরে আসার পথে উপর থেকে নিচে নামার ঝুঁকি, তারপর আবার রাত। ঘন জঙ্গলঘেরা অন্ধকার রাতে ভয়ংকর পাহাড়ী রাস্তায় চলতে গিয়ে ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। এমনকি আমরা ইফতারীর কথা পর্যন্ত ভুলে যাই। মাগরিবের প্রায় আধা ঘণ্টা পরে ইফতারীর কথা মনে পড়ে। ফেরার সময় একটা কথাই মনে বাজছিল, এইরূপ অপার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশের মূল দাবীই হল–আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অবশ্যম্ভবীতা, যা মূর্খ নাস্তিকরা অনুধাবন করতে পারে না, আর পারলেও স্বীকার করে না।

বানারাসের মুসাফিরখানা : ঈদুল ফিতরের ২ দিন পর কিষাণগঞ্জ থেকে ইউপি (উত্তর প্রদেশ) এর রাজধানী লাক্ষ্ণৌ-এর উদ্দেশ্যে একাই রওয়ানা হই। ভোর সাড়ে ছয়টার দিকে 'নাদওয়াতুল ওলামা' নামক উপমহাদেশের সেই বহুল প্রসিদ্ধ মাদরাসায় পৌঁছে ফজরের ছালাত আদায় করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এক বিশাল এলাকা জুড়ে মাদরাসার

নাদওয়াতুল ওলামা

অবস্থান। অভ্যন্তরীণ ফাঁকা জায়গাগুলো অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিকল্পিতভাবে ছেটে রাখা নজরকাড়া পাতাবাহার ও ফুলের বাগানে সুশোভিত। আরবী সাহিত্য, হাদীছ, ফিক্‌হসহ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভবন। ফাযিলিয়াত (দাওরা) ২ বছরের কোর্স। এর পূর্বে আলিয়া ৪ বছরের কোর্স। ছাত্ররা নিজস্ব খরচে (মাসিক ৫০০ রূপী) পড়াশোনা করে। সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন শেষে আমি 'জামে'আ সালাফিয়া বানারাসে'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। প্রায় বিকাল ৫টার দিকে বানারাসের রেউরিতালায় অবস্থিত 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দে'র কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামে'আ সালাফিয়া'য় পৌঁছি। সেখানে পৌঁছার পর মূল চিন্তা ছিল বিদেশ-বিভূঁইয়ে রাত কোথায় কাটাব। পরিচিত বলতে এখানে কেউ নেই। আর শহরের মসজিদগুলো এশার পরপরই তালাবদ্ধ হয়ে যায়। পরিশ্রান্ত অবস্থায় চারিদিক থেকে হতাশা এসে ঘিরে ধরল। হোটেলে থাকা তো অনেক ব্যয়বহুল, যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করার পর একজন বলল আপনি এখান থেকে নয়সড়ক, ডালমণ্ডি যান। সেখানে একটি মুসাফিরখানা আছে, যেখানে কম খরচে থাকতে পারবেন। সেখানে পৌঁছার পর জানে পানি ফিরে পেলাম। রুম ভাড়া রুমের মান অনুযায়ী ২৩ থেকে ৭০ রূপী পর্যন্ত। বারান্দা ৬ রুপী। আর জিনিস-পত্র রাখার আলমারী ১২ রুপী। মাত্র ২৩ টাকায় একদিনের জন্য সিঙ্গেল রুম ভাড়া পাওয়া যায়। ডালমন্ডির মুসলিম সমাজের নিজস্ব দানে পরিচালিত হয় মুসাফিরাখানা। বহু দরিদ্র অসহায় মানুষ যাদের কোন সহায়-সম্বল নেই, তারা অল্প খরচে এখানে অবস্থান করে কোন না কোন আয়ের পথ বের করতে সক্ষম হয়। এখানে বহু মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয় যাদের জীবনে অনেক আশা ছিল। যারা অনেকেই নির্যাতনের শিকার হয়ে পলাতক। আবার অনেকেই অভিমান করে এসেছেন। তাদের সকলের নতুন জীবন শুরু হয়েছে এই মুসাফিরখানাকে ভিত্তি করে। অসহায় মানবতা ও পথহারা পথিকের তাই শেষ অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মুসাফিরখানা। সত্যি বলতে কি পবিত্র কুরআনে মুসাফিরের সহযোগিতা সম্বলিত আয়াতগুলির বাস্তব নমুনা এ মুসাফিরখানা। আল্লাহ বলেন, 'তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বল, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয় সে ব্যাপারে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত' *(বাক্বারা ২১৫)*।

হেফজখানায় ছাত্রদের হীনমন্যতা : বানারাস মাদরাসায় ভর্তির সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই ভাবছি কি করব। অবশেষে এই মুসাফিরখানায় থেকেই একটি হেফজখানা খুঁজে ভর্তি হই। হাফেজী মাদরাসায় পড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। প্রায় ৫ মাস হেফজখানায় কাটানোর পর আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। চেটগঞ্জ ও সিলেটে বাজারের দুইটি মাদরাসার মোট ১০০ জন ছাত্রের প্রায় সকলের উপর আমার ব্যক্তিগত জরিপ থেকে বুঝতে পারি, গড়ে প্রায় সব হেফজখানার ছাত্রদের একই অবস্থা। প্রায় ৪০/৫০ ছাত্র যাদের বয়স হবে ১৮-২৫ বছরের মধ্যে। বাকীরা ছোট। প্রথমতঃ এই ছাত্ররা আরবী ভাষা জানেনা তথা কুরআনের অর্থ জানেনা। হাদীছ, ফিক্‌হ, বালাগাত, ফারায়েয তো বহুদূরের কথা। দ্বিতীয়তঃ বহির্বিশ্বের পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে এরা একেবারেই ওয়াকিফহাল নয়। এমনকি অনেকেই তাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি পর্যন্ত ভালভাবে পড়তে পারেনা। এদের অধিকাংশের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তারাবীহ পড়ানো, ইমামতি করা, মিলাদ পড়ানো। সত্যি বলতে কি স্রেফ কুরআন মুখস্তকারী, দ্বীনী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ এই ইমামদেরকে জনগণ আলেম বলে মানবে এবং তাদের দেওয়া ফৎওয়া মেনে চলবে। তা'হলে সমাজের অবস্থা কি দাড়াতে পারে তা মহানবী (ছাঃ)-এর বাণীতেই খুব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি–আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন ও হাদীছের বিদ্যা ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন না বরং আলেম উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে উঠিয়ে নেবেন। এমনকি মানুষ অজ্ঞ মূর্খদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করলে তারা ইলম ছাড়াই ফৎওয়া দিবে এবং নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে ও অপরকে পথভ্রষ্ট করবে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২০৬)*। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান থেকে এই দূরত্ব সৃষ্টিই মুসলিম সমাজের অধঃপতনের মূল ও একমাত্র কারণ।

অন্যদিকে কুরআনখানি, চল্লিশা, সাবীনা খতম, ফাতেহা পাঠ আরো নাম না জানা কত শত বিদ'আতী অনুষ্ঠানের সব চাপ হেফজখানার ছাত্রদের উপর। এরা নিজে পড়বে, না কি অনুষ্ঠানপ্রিয় ধনীদের গোলাম হয়ে ইসলামকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করবে? এ ছাড়াও ছোট বয়স থেকে মানুষের দেয়া অর্থের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে থেকে এই ছেলেগুলি ধনীদের টাকার গোলামে পরিণত হয়। ফলে

পরবর্তী জীবনেও তারা টাকার সামনে মাথা উঁচু করতে পারে না, বুক ফুলিয়ে সাহসের সাথে সত্য বলতে পারেনা।

মূলত ছেলেরা স্কুলে যেভাবে ইংরেজী B তে B00K শিখে একই সাথে এর অর্থও জেনে নিচ্ছে। ঠিক তেমনি আরবী শেখার সময় 'আলিফে' 'আহাদ' মানে 'এক' যদি জানত এবং পুরোপুরি না হলেও আবছা আবছা অর্থ বুঝে কুরআন হেফজ করত, তাহলে তাদের মধ্যে এতটা অজ্ঞতা থাকতনা। এছাড়া আমাদের মাদরাসাগুলোতে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১২ বছরের সিলেবাসের সাথে কুরআন মুখস্ত করানোর ব্যবস্থা করা যায় এবং হাদীছের দাওরার সাথে কুরআনেরও দাওরা চলে, তাহলে এটা একটা বড় পদক্ষেপ হবে। এইরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভবিষ্যৎ মুসলিম সমাজ হয়তোবা অজ্ঞতার বেড়াজাল থেকে অনেকটাই মুক্তি পেতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অধীর আগ্রহে এমন একটি সিলেবাস দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!! ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা বলে রাখি, এ দুই মাদরাসায় অবস্থানকালীন আল্লাহ আমাকে মোটামুটি ৩ মাসের মধ্যেই পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করার তাওফীক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। তবে মুখস্থ ধরে রাখা যে কত কঠিন ও কত বেশী দাওরার প্রয়োজন তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

জামে'আ সালাফিয়া বানারাসের অভিজ্ঞতা : রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'কিয়ামতের আলামত হচ্ছে বিদ্যা উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা বেড়ে যাবে, যেনা বৃদ্ধি পাবে এবং বেশী বেশী শরাব পান করা হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২০২)*।

জামে'আ সালাফিয়া

কিন্তু বাস্তবতা যেন এর উল্টো। আজ থেকে ১০ বছর পূর্বে যতগুলো মাদরাসা ছিল এখন সে সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। আর আগে যে ছাত্রসংখ্যা ছিল এখন তার চাইতে ছাত্রসংখ্যাও অনেক বেশী। দিন দিন বিভিন্ন ক্যাটাগরীর বাহারী নাম ও চমকপ্রদ মোড়কে সাড়া জাগানো পরিকল্পনা নিয়ে বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষাও লাগামহীন গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে বিদ্যা উঠে যাচ্ছে কিভাবে, বাহ্যত বৃদ্ধিই তো পাচ্ছে? মূলত হাদীছের উদ্দেশ্যটি এই আয়াতের মধ্যে লুকিয়ে আছে– **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** অর্থাৎ 'জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে'। তথা যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই জ্ঞানী। সুতরাং নবীর বলা বিদ্যা বা জ্ঞানের মূল মাপকাঠি হ'ল তাক্বওয়া। একজন মূর্খ তাক্বওয়াবান, একজন জ্ঞানী পাপীর চাইতে শ্রেয়। দেশের হানাফী-আহলেহাদীছ বড় বড় ৬টি মাদরাসা এবং বিদেশের বড় ২টি ও ছোট প্রায় ৭টি মাদরাসার অবস্থা দেখার পর আমার সামনে এই আয়াতটিই বার বার ভেসে উঠেছে। আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, এই যামানায় বিদ্যা অর্জন করা কঠিন কিছু নয়, কিন্তু বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য তথা তাক্বওয়া অর্জন করা বড়ই কঠিন। জাতির পথপ্রদর্শক মাদরাসা ছাত্ররা আজ অপসংস্কৃতির ভয়াবহ ছোবলে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে। মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট জাতির পথপ্রদর্শকদের আদর্শচ্যূত করে ফেলেছে। বিদ্যা তাদেরকে ধর্মপ্রাণ করেছে, কিন্তু ধর্মভীরু করেনি। একদিকে বুখারীর দারস অন্যদিকে নাটক-সিনেমা, একদিকে কুরআন তিলাওয়াত অন্যদিকে এয়ারফোন, একদিকে মসজিদের আযান অন্যদিকে প্রেমালাপ। হায় আক্ষেপ! ওঝাকে যদি ভূতে ধরে ভূত ছাড়াবে কে?

আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাংগঠনিক তৎপরতার মরুভূমি : 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর মারকাযী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামে'আ সালাফিয়ার সাথে এই পাঁচ মাসে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। প্রায় প্রতি শুক্রবারে জুম'আর ছালাত এখানেই পড়তাম। এখানে ছাত্রসংখ্যা ৭০০/৮০০। ৫৮০০০ বই সমৃদ্ধ একটি বিশাল কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী রয়েছে এখানে। মাদরাসার পশ্চিম পার্শ্বে সুরম্য মসজিদ। বাদশাহ ফয়সালের সহযোগিতায় ১৯৬৩ সালের দিকে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বছরের আলেমকে H.S.C এবং ৩ বছরের ফযিলিয়্যতকে বি.এ.–এর মান দেয়। এ সার্টিফিকেট দিয়ে ভারতের প্রায় ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ও জামেয়া মিল্লিয়া ইউনিভার্সিটি দিল্লী। বর্তমান বছরের ৩১শে মে মার্চ পর্যন্ত ফরম বিতরণ ও ২৫শে জুলাই ভর্তি পরীক্ষা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই মাদরাসার অনেক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেও আমি আহলেহাদীছ সংগঠনের আমীরের নাম সংগ্রহ করতে পারিনি। এখান থেকে **محدث** (উর্দু) ও صوت الأمة (আরবী) নামে দুটি পত্রিকা বের হয়। বর্তমান নাযিম আব্দুল্লাহ সঊদ। আমি নওদাপাড়ার সাথে তুলনা করে আঁচ করতে পারলাম যে, এরা আরবী ও ইংরেজী কথা বলা ও লেখায় অধিক পারদর্শী হলেও সাংগঠনিকভাবে খুবই দুর্বল। শাহ ইসমাঈল ও সৈয়দ আহমাদের জাযবার লেশমাত্র এদের মাঝে নেই। ঘুমন্ত আহলেহাদীছ সমাজের জন্য কিছু করার অনুপ্রেরণা আমি তাদের মাঝে খুঁজে পাইনি। তার অন্যতম কারণ হিসাবে আমি যা বুঝতে পারি তা হল পুরো ইণ্ডিয়ায় ছাত্রদের জন্য সেরকম কোন যুবসংগঠন নেই। কেরালায় একটি আছে যারা তাদের নিজস্ব স্থানীয় ভাষাভাষীদের মধ্যে কার্যক্রম চালায়। তাছাড়া 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এরও কোন কার্যক্রম সেখানে দেখিনি। কেবল এতটুকুই শুনেছি গত ২/৩ মার্চ দিল্লীর রামলীলা ময়দানে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দে'র কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে কাবা শরীফের ইমাম প্রধান অতিথি ছিলেন। তবে বানারাসেই জামেয়া সালাফিয়া থেকে ৫/৬ কিঃ মিঃ দূরে একটি মাদরাসা আছে নাম 'ইহয়াউস সুন্নাহ' (রাজারবিহা)। এখানে একটি আহলেহাদীছ মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি যুবসংগঠন গড়ে উঠেছে নাম– 'জমঈয়তু শুব্বানিল মুসলিমীন'। যার আমীর জুনায়েদ মাক্কী এবং নায়েবে আমীর আব্দুল কাইয়ুম মাক্কী। এটি আবার যুবকদের নিয়ন্ত্রিত কোন সংগঠন নয়। বরং নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মুবাল্লিগের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। উক্ত সংগঠনের সাথে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর কোন সম্পর্ক নেই। এই দেশে SIO (Student Islamic Organization) এবং ISO সহ অন্যদলগুলোর যুবসংগঠন থাকলেও আহলেহাদীছের কোন যুব সংগঠন না থাকাটা আমার বিবেকে ধাক্কা দিয়েছে। আহলেহাদীছদের অনেক বই খুঁজেছি, পড়েছি। কিন্তু আহলেহাদীছ সম্পর্কে জানার জন্য ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের লিখিত থিসিসের মত তথ্যসমৃদ্ধ বইও আমি পাইনি।

যাহোক দীর্ঘ এ ছয় মাসে ভারতে অবস্থানকালে যতটুকু অভিজ্ঞতাটুকু আমার হয়েছে তা নিতান্ত অপ্রতুল নয়। ভাল-মন্দ মিলিয়ে এ অভিজ্ঞতাগুলো আগামী দিনে আমার জীবনের পথ চলায় দিকনির্দেশনা দেবে এটা সুনিশ্চিত।

দাঁড়ি রাখতে হবে কেন?

শরীফ আবু হায়াত অপু

একুশের প্রথম প্রহর। শহীদ মিনার প্রাঙ্গন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিএনসিসির ক্যাডেট হিসেবে দায়িত্ব পড়েছে শহীদ মিনারের রাতের প্রথম প্রহরের শৃঙ্খলা রক্ষার। কাজটা খুব সহজ না, কারণ যারা ঐ সময়ে ফুল দিতে আসে তাদের মূল লক্ষ্য ক্যামেরা। আমার পরনে ন্যাভাল ক্যাডেটের ইস্ত্রি করা পরিপাটি সাদা পোশাক আর সাদা ক্যাপ। গম্ভীর মুখ ও স্বরে যখন বলছিলাম 'এখানে না রাস্তায় গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করুন' তখন খুব উচ্ছৃঙ্খল লোকগুলোকেও দেখছিলাম কিছুটা মিইয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে কেটে পড়তে। বাতাসে ভেসে আসা টুকরো মন্তব্যগুলো শুনতে ভালো না লাগলেও পরণের উর্দির দাপটটা বুঝিয়ে দিয়েছিল বেশ!

উর্দি মনে অহংকার জন্ম দিলেও এর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু তা ছিলনা। এর উদ্দেশ্য একই সাথে– আলাদা করা এবং এক করা। যেমন জলপাই রঙের ডোরাকাটা পোষাক দেখলে বোঝা যায় এই মানুষটি আমার এবং আমার মত যদু-মধু থেকে আলাদা, আনসার-ভিডিপি-পুলিশ এমনকি বিমান আর নৌ বাহিনী থেকেও আলাদা। আবার আপন পরিসরে এই পোশাকটা নিজের বাহিনীর সবার সাথে তার একটা একাত্মতাবোধ সৃষ্টি করে, তাকে তার দায়িত্ব, কর্তব্য আর মর্যাদার কথা সবসময় মনে করিয়ে দিতে থাকে। কোন বাহিনীর সদস্য সেই বাহিনীর পোশাক পরবেনা এমনটা একেবারেই অসম্ভব। এমন অকল্পনীয় অসম্ভবটা খালি একটি ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে যায়– মুসলিমদের ক্ষেত্রে।

মুসলিম মানে আসলে কি? আল্লাহ্কে একমাত্র সত্য 'ইলাহ্' হিসেবে স্বীকার করে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে সমর্পণ যে করে সেই মুসলিম। ইসলামকে একটা জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বেছে নিতে হয়। বেছে নেবার পর ইসলামের বিধিবিধানগুলো জানতে হয় ও দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিতে হয়। এসব নিয়ম-কানুন আমাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। আমি কোন কাতে ঘুমাবো, কোন হাতে খাব, কোন পা দিয়ে টয়লেটে ঢুকব–এসব আপাত অতি তুচ্ছ ব্যাপারে যেমন ইসলামের দিক-নির্দেশনা আছে; তেমন আমি কোন চাকরি করব, কিভাবে ব্যবসা করব, কিভাবে শাসন করব, কোন আইনে বিচার করব সেসব সামাজিক ব্যাপারেও আছে। এমনকি আমি কাকে বিয়ে করবো, নিকটজনের কাকে কতটা সম্পত্তি দেব–এসব অতি ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ইসলামের কিছু না কিছু বলার আছে। মোটকথা একটা মানুষ ঘুম থেকে জেগে আবার ঘুমতে যাওয়া অবধি যা কিছু করে সব কিছুর জন্যেই ইসলাম কিছু মূলনীতি দিয়েছে। স্বাধীনচেতা কারো কাছে মনে হতে পারে– ইসলাম মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। মানুষের জীবনের প্রতি পদে যেটা মানুষের জন্য মঙ্গল সেটাই তাকে করতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন মানেই শৃংখল নয়, তা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পরিমিতি দেয়ার একটা উপায়। এটা ব্যক্তির জন্য মঙ্গলকর তো বটেই, সমাজের অন্য মানুষদের জন্য কল্যাণকর। এক অপ্সরী রমণী সেজেগুজে সবার চোখ ধাঁধিয়ে নারীস্বাধীনতা চর্চা করল। সে রূপের ছটা যাদের চোখে গেঁথে গেল তারা এখন বিয়ের কনে দেখবার কালে কালো তো কালো, শ্যামলা বরণ দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। 'মনের সৌন্দর্য আসল সৌন্দর্য'–এসব তত্ত্ব কথা হিসেবে চর্চিত হতে থাকল, আসল জীবনে বাজলো রঙ-ফর্সা ক্রিমের জয়গান।

একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব বোঝা যায় তার পোষাক-আশাকে। মুসলিম পুরুষদের অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে আলাদা করতে, তাদের মধ্যে একতাবদ্ধতা তৈরী করতে আল্লাহ তাদের একটা ইউনিফর্ম দিলেন। সেটা হল–ঢিলেঢালা, অস্বচ্ছ, পুরুষালী পোশাক যা পায়ের গোড়ালির উপর থাকবে। মুখে প্রাকৃতিক দাড়ি থাকবে, গোঁফটাকে কেটে ছোট রাখতে হবে। এমন একটা বেশভূষা যেটা যে কোন ভৌগলিক অঞ্চলের মানুষরা পরতে পারবে। বাংলাদেশের মুসলিম বোতসোয়ানা, স্পেন কী কানাডায় গিয়ে এমন পোশাক পরা মানুষকে দেখেই একগাল হাসি হেসে বলতে পারবে–'আস-সালামু আলাইকুম'। ভাষা আর জাত-পাতের ভেদাভেদ ভেঙে ভ্রাতৃত্বের কি এক অপূর্ব বন্ধন!

ইসলামী ইউনিফর্মের যে অংশটাকে সাধারণ মুসলিমরা তো বটেই, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা পর্যন্ত থোড়াই কেয়ার করছে সেটা হল–দাড়ি। শায়খ মুহাম্মদ আল-জিবালি দেখিয়েছেন দাড়ি কেটে একজন মানুষ কত ভাবে ইসলাম লঙ্ঘন করে–

১. আল্লাহ সুবহানাহুর অবাধ্যতা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, পারস্যের সম্রাট কিসরা ইয়েমেনের শাসকের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে দু'জন দূত পাঠান। এদের দাড়ি ছিল কামানো আর গোঁফ ছিল বড় বড়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তাদের এই অবয়ব এতই কুৎসিত লেগেছিল যে তিনি মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের ধ্বংস হোক, এমনটি তোমাদের কে করতে বলেছে? তারা উত্তর দিল, আমাদের প্রভু কিসরা। তিনি (ছাঃ) তখন উত্তর দেন, আমার রব! যিনি পবিত্র ও সম্মানিত, আদেশ করেছেন যেন আমি দাড়ি ছেড়ে দেই এবং গোঁফ ছোট রাখি *(ফিকহুস সিরাহ, পৃঃ ৩৫৯, সনদ হাসান)*।

আল্লাহ্র অবাধ্যতাতে মগ্ন হবার সময় আমাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহ্র একটি মাত্র আদেশের অবাধ্যতা করে শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা :

ইবন উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের আদেশ করেছেন, 'গোঁফ ছোট করে কেটে রাখ, আর দাড়িকে ছেড়ে দাও' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ যে মানছে সে মূলত আল্লাহ্র আদেশই মানছে *(নিসা ৮০)*। আর যে রাসূলের (ছাঃ) আদেশ মানলোনা সে আল্লাহ্র আদেশেরই অবাধ্য হল *(মুত্তাফাক আলাইহ হা/৩৬৩১)*।

যারা ভাবছেন আল্লাহ ও তার রাসূলের (ছাঃ) কিছু আদেশ না মানলেও চলে, তাদের জন্য আল্লাহ কঠোর সতর্কতাবাণী দিয়েছেন–'...আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে *(জিন ২৩)*।

৩. আম্বিয়ায়ে কেরামের (আঃ) সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি :

আল্লাহ প্রেরিত সব নবী-রাসূলের বর্ণনায় দাড়ির কথা পাওয়া যায়। সূরা ত্বহা-তে হারুন (আঃ)-এর দাড়ির বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ আমাদের নিশ্চিত করেছেন যে, শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রতিটি মুসলিমের জন্য 'উস্ওয়াতুন হাসানা'–সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, কর্মে বা গড়নে *(আহযাব ২১)*। জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাড়ি ছিল অনেক বড়। এখন একজন ক্লিন শেভ্ড মুসলিম আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখুক কাফির সম্রাট সারকোজির সাথে তার চেহারা বেশী মেলে, না রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে। একজন দাড়ি সাইজ করে রাখা মুসলিম আয়নায় দাঁড়িয়ে ভাবুক রাসূল (ছাঃ)-এর ছেড়ে দেয়া দাড়ির চেয়ে সে কেন বেছে নিল রাসূল (ছাঃ)-কে অপমানকারী লেখক সালমান রুশদির সাহিত্যিক দাড়িকে।

৪. ছাহাবাদের সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের দৈহিক বর্ণনার মধ্যে দাড়ির দৈর্ঘ্যের কথাও এসেছে। আবু বকর (রাঃ)-এর দাড়ি ঘন ছিল, উমার ও উছমান (রাঃ)-এর দাড়ি ছিল দীর্ঘ। আলী (রাঃ)-এর দাড়ির দৈর্ঘ্য ছিল দু'কাঁধের দূরত্বের সমান *(আল-ইছাবাহ)*।

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে রাসূল (ছাঃ) দাঁত দিয়ে হলেও আঁকড়ে থাকতে বলেছিলেন। দাড়ি ছোট করতে করতে পাতলা ঘাসের স্তর বানিয়ে কার সুন্নাতের দিকে যাচ্ছি আমরা?

৫. কাফিরদের অনুকরণ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আদেশ করেন–'গোঁফ ছোট কর ও দাড়ি বড় কর, মাজুসীদের (পারস্যের অগ্নি উপাসক) বিরোধিতা কর *(মুসলিম হা/৬২৬)*।' আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আদেশ করেছেন–'গোঁফ ছোট কর ও দাড়ি বড় কর, কিতাবধারীদের (ইহুদি-খৃষ্টান) বিরোধিতা কর *(আহমাদ হা/২২৩৩৭, সনদ ছহীহ)*।' ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন– 'মুশরিকদের চেয়ে আলাদা হও–গোঁফ ছোট কর ও দাড়ি বড় কর *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বার বার সাবধান করে বলেছেন– যে যাকে অনুকরণ করবে সে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৪১)*। আমরা কাতর আহ্বান জানাই প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে, সূরা ফাতিহাতে–'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায্ যল্লিন'। কাদের থেকে আলাদা হতে চাই? তাদের থেকে যারা সত্য জানার প্রতি বিমুখ ছিল, তাদের থেকে যারা সত্য জেনেও মানেনি। তবে কি আমরা রাসূল (ছাঃ) এবং তার সাহাবীদের (রাঃ) পরিবর্তে অনুসরণ করছি মুশরিক-ইহুদি-খৃষ্টান-অগ্নিউপাসকদের– যাদের অন্তিম পরিণাম জাহান্নামের আগুন?

৬. আল্লাহ্র সৃষ্টিতে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই পরিবর্তন :

আল্লার কাছে অন্যতম ঘৃণিত ব্যাপার হলো তার সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনা, যার অনুমোদন তিনি দেননি। একজন পুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার বহিপ্রকাশ হবে তার চেহারায়–এটাই আল্লাহর সৃষ্টি। যে দাড়ি কাটছে সে আল্লাহ্র সৃষ্টি বদলে দিচ্ছে, মেনে নিচ্ছে শয়তানের আদেশ। আল্লাহ পাক আমাদের সূরা নিসায় সাবধানবাণী জানিয়েছেন এভাবে – 'আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন। আর সে বলেছিল–আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নিব ... তাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব আর তারাই আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। আর আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবক বানিয়ে নিলে সে নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য ক্ষতিতে আক্রান্ত হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন ঐসব নারীর ওপর, যারা শরীরে উল্কি আঁকে ও আঁকায়; যারা ভ্রু তুলে কপাল প্রশস্ত করে এবং সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও দু'দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী (এভাবে) আল্লাহ্র সৃষ্টির আকৃতিকে বিকৃত করে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৩০)*।

এখন সৌন্দর্য বাড়াতে যদি কোন মেয়ে কপালের লোম তুলে আল্লাহ্র অভিশাপের যোগ্য হয় তবে একজন পুরুষ–যার বৈশিষ্ট্যই মুখে দাড়ি থাকা–তার অবস্থা কি হবে?

৭. নারীদের অনুকরণ :

ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেসব পুরুষদের অভিসম্পাত করেছেন যারা নারীদের অনুকরণ করে, আর সেসব নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষের অনুকরণ করে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)*।

যে মুসলিম পুরুষ আল্লাহ্র দেয়া দাড়ি নিয়ে অস্বস্তিতে থাকে, সেটাকে কেটে সাফ করে মেয়েদের মত মুখায়বকে স্মার্টনেস ভাবে তারা আসলে নিজের পুরুষত্ব নিয়েই অতৃপ্ত থাকে। মেয়েদের আল্লাহ একভাবে বানিয়েছেন, পুরুষদের আরেকভাবে। এখন রাত যদি দিনের মত হয়ে যায়, আর দিন রাতের মত, তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে? নারী-পুরুষের পরস্পরের অনুকরণের কুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি সমকামিতার প্লেগ আর বিবাহ-বিচ্ছেদের বন্যায়। আল্লাহ্র অভিশাপ মাথায় নিয়ে পরকালে কেন, ইহকালেও ভাল থাকা যায়না, যাবেনা।

৮. বিশুদ্ধ ফিতরাতের বিরোধিতা :

প্রতিটি শিশুই বিশুদ্ধ প্রকৃতির উপর জন্মায় যাকে বলে ফিতরাত। পরে পরিবেশের প্রভাবে, শয়তানের ধোঁকায় কিংবা আত্মপ্রবঞ্চণায় সে তা থেকে সরে যায়। আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন– 'দশটি আচরণ ফিতরাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত– গোঁফ কাটা, দাড়ি ছেড়ে দেয়া, দাঁত মাজা, নাক ও মুখের ভিতর পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙুলের মাঝে ধোয়া, বগলের লোম পরিষ্কার করা, লজ্জাস্থানের চুল পরিষ্কার করা, লজ্জাস্থান পানি দিয়ে ধোয়া ও খাৎনা করা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯)*।

এই ফিতরাতের আচরণগুলো সকল যুগের সকল মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য।

৯. ইসলামকে উপহাস :

দাড়ি না রাখতে রাখতে সমাজের অবস্থা এমন হয়েছে যে, যদি কোন মুসলিম দাড়ি রাখে তাহলে তাকে জেএমবি বলে কটাক্ষ করা হয়, অথচ জংলী বাউল গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল বানিয়ে ফেললে তা রক্ষা করতে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করে। চারুকলার দাড়ি স্পর্ধিত বিপ্লবী চে গুয়েভারার আর মুসলিম যুবকের দাড়ি লজ্জার, পশ্চাৎপদতার!

মুসলিম দাড়ি দেখে অমুসলিমদের গাত্রদাহ হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু একজন মুসলিম যদি শ্মশ্রুমণ্ডিত কোন মানুষকে উপহাস করে বলে– 'মনের দাড়িই আসল দাড়ি' বা 'আমার দাড়ি নেই তো কি হয়েছে আমার ঈমান পাকা–তাহলে তার জেনে রাখা উচিত ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে উপহাস করার ফলাফল ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন– '...বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে উপহাস করেছিলে? কোন অজুহাত পেশ করো না! তোমরা ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছ...*(তাওবা ৬৫-৬৬)*।

পরিশেষে, আমাদের মধ্যে একটা বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা হল যে দাড়ি রাখা সুন্নাত, সুতরাং এটা রাখলেও চলে, না রাখলেও চলে। রাসূলের যেসব সুন্নাত সব মানুষের অনুকরণের জন্য–তাকে বলে সুন্নাতে ইবাদাত। রাসূল (ছাঃ) যা মানুষ হিসেবে করেছেন এবং সাধারণের স্বাধীনতা উন্মুক্ত রেখেছেন সেটাকে বলে সুন্নাতে আদাত। যেমন রাসূল (ছাঃ) কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলও রাখতেন আবার ছোট করে কেটেও রাখতেন। এটা সুন্নাতে আদাত। কিন্তু তিনি দাঁড়ি কখনো কাটেননি, কাটার অনুমতি দেননি, বরং তা ছেড়ে দিতে বলেছেন। তাই দাড়ি রাখা সুন্নাতে ইবাদাত হিসেবে ওয়াজিব, যা লঙ্ঘনের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহ ও তার রাসূলের (ছাঃ) অভিশাপের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়। ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনে তায়মিয়া, ইবন হাযম, বিন বায, নাছিরুদ্দীন আলবানীসহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল আলিম দাড়ি কাটাকে হারাম বলেছেন *(শায়খ মুহাম্মদ আল জিবালি, আল লিহইয়াতুল বাইনাস সালাফ ওয়াল খালাফ)*।

আমাদের উচিত নিজেদের প্রশ্ন করা কোন রব্কে খুশী করার জন্য দাড়ি কাটছি– স্ত্রী? অফিসের বস? বন্ধু-বান্ধব, সমাজের মানুষ? আত্মপ্রবৃত্তি? যিনি আল্লাহকে সত্যিই রব্ হিসেবে মেনে নিয়েছেন তার মনে রাখা উচিত মুমিনদের কথা হল– 'সামি'না ওয়া আতা'না'– আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। দাড়িকে আমরা যতটা তুচ্ছ ভাবছি, আল্লাহ্র অভিশাপ কিন্তু ঠিক ততটা তুচ্ছ নয়।

আল্লাহ আমাদের সত্যই ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার তাওফীক দিন। আমীন!

স্বাধীনতা, আমার স্বাধীনতা

-রেহনুমা বিনতে আনীস
ক্যালগেরী, আলবার্টা, কানাডা

বাংলাদেশের গড় আয়ু হিসেব করলে আমার জীবনের অর্ধেকের বেশী সময় পার হয়ে গেছে। এর অর্ধেকের বেশী কেটেছে দেশের বাইরে। এখন অবস্থান করছি দেশ থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বে, সময়ের হিসেবে ঠিক বারো ঘণ্টা, বাংলাদেশে যখন দিন তখন আমাদের রাত।

বিসিএস পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষকমণ্ডলী, রসিকতা করেই কি না জানিনা, বাংলা বারো মাসের নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। যখন গড়গড় করে বলে দিলাম তাঁরা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের ধারণা ছিল যারা বিদেশে বড় হয় তারা এসব জানেই না, দেশে বড় হয়েই অনেক ছেলেমেয়ে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনা!' বললাম, 'আসলে যারা দেশের বাইরে থাকে তাদের দেশের প্রতি টানটা হয় অনেক বেশী। দেশের লোকজন দেশকে অনেকটা for granted ধরে নেয়। কিন্তু আমরা জানি বাইরে থাকলে দেশের জন্য, দেশের মানুষজনের জন্য কতটা টান অনুভব হয়। আমরা নিজেরা খেয়ে না খেয়ে দেশের মানুষের জন্য টাকা পাঠাই যেন তারা ভাল থাকে। আমাদের মরুভূমির বালি বা বরফের দেশে তুষারের বালিয়াড়ি দেখে চোখ হাঁপিয়ে ওঠে বাংলার সবুজ শ্যামল শস্যক্ষেত্রের সৌন্দর্যে অবগাহন করার জন্য; ইংরেজী, আরবী আর হরেক ভাষার ধ্বনির মাঝেও কান হাঁপিয়ে ওঠে বাংলা শোনার জন্য। হাজার মানুষের প্রাণস্পন্দনের ভীড়েও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে একজন দেশী মানুষের মুখ দেখার জন্য। আমরা প্রতিটি বাংলাদেশী উৎসবে আনন্দিত হই যদিও যেদেশে থাকা হয় তাদের সেলেব্রেশন কবে আসে কবে যায় আমরা টেরও পাইনা। অধীর হয়ে বসে থাকি দেশের খবর শোনার জন্য। অস্থির হই দেশের খবর পড়ার জন্য। অপরিচিত কাউকে বাংলা বলতে শুনলে রাস্তায় থামিয়ে কথা বলি যেন আমাদের কতদিনের আত্মীয়! সুতরাং, আমরা বাইরে থাকি বলে দেশকে কম ভালোবাসি, এই ধারণাটা ভুল"।

ছোটবেলায় আবুধাবীতে ছিলাম। স্কুলে বন্ধুদের মধ্যে, প্রতিবেশীদের মাঝে, দোকানে, রাস্তায়, সমুদ্রতীরে সর্বত্র ছিল ইরাকী, ইরানী এবং ফিলিস্তিনীদের ছড়াছড়ি। তখন ইরাক-ইরানের যুদ্ধ চলছে। কিন্তু বিদেশে ওদের মধ্যে নেই কোন হিংসা, নেই কোন বিদ্বেষ। ওদের চোখের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন সে চোখে কেবল যুদ্ধবিধ্বস্ত মাতৃভূমির জন্য প্রাণের আকুতি। মুখের ওপর শত আনন্দেও কেমন যেন এক শংকার ছায়া। ফিলিস্তিনীদের দেখতাম ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। শুধু ছেলেমেয়েগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বড় হলে পাঠিয়ে দেবে দেশে, যেন ওরা দেশের জন্য কিছু করতে পারে, দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারে। Hopeless জেনেও কি যেন এক আশায় ভর করে তারা দশকের পর দশক এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে!

অনার্স-মাস্টার্সের সময়টা কেটেছে ইণ্ডিয়াতে। দিল্লীতে বাবার কাজ ছিল আফগান এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা। বিভিন্ন সময় বাবার সাথে অফিসে গিয়ে দেখেছি অফিসের দোভাষী ছেলেমেয়েগুলোকে। অসম্ভব স্মার্ট এই তরুণ-তরুণীগুলোর কেউ কেউ ডাক্তারী পড়তে পড়তে একদিন প্রাণের দায়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে দেখল এখানে সে একজন অশিক্ষিত বেকার বৈ কিছুই নয়! সংসার চালানোর জন্য এই দোভাষীর কাজ পেয়েই তাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। আর যারা দেশেই অশিক্ষিত ছিল সেই মানুষগুলোর অবস্থা আরো নিষ্করুণ। সেই রামাযানের দিনে, ভরদুপুরে, দিল্লীর সেই কনকনে শীতে, কাঠফাটা রোদে, গার্ডদের লাথিগুঁতো খেয়েও মানুষগুলো মাঠের মধ্যখানে বসে থাকত, যদি আজ একটা কিছু ব্যবস্থা হয়! তাদের সবার চোখে স্পষ্ট দেখা যেত স্বদেশের সেই উষর প্রান্তরে ফিরে যাবার প্রবল আকাংখা, যদি কোনক্রমে প্রাণটুকুই রক্ষা করার ব্যবস্থা করা যায়!

যখন বাংলা পাঠ্যবইয়ে পড়তাম, 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা সূর্য ছিনিয়ে এনেছি। এই একখণ্ড স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের অহংকার'–গর্বে বুক ফুলে উঠত। আমার দুর্গত বন্ধুদের জন্য করুণা হত। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়া– সে হোক না দরিদ্র বা পিছিয়ে থাকা ক্ষুদ্র একটি দেশ– সে যে কি আরামের, কি আনন্দের তা কি করে বোঝানো যায়? পার্থক্যটা অনেকটা নিজের বিছানায় আর পরের বিছানায় ঘুমানোর মত। মাটিতে চাদর পেতে, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে যে শান্তি, ফাইভ স্টার হোটেলের রাজকীয় বিছানায় শুয়েও সে শান্তির ঘুম আসেনা, তা আরামের হেরফের যেমনই হোক না কেন।

পরবর্তীতে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই অহংকারকে কেমন যেন ফাঁকা মনে হতে থাকে। যখন মাদ্রাজ ছিলাম, আমার পাশের বাসার বান্ধবী একদিন খুশীতে দৌড়ে এসে বলল, 'জানো, আমরা ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বন্ধ করে দিয়েছি!' আমার পাণ্ডুর চেহারা দেখে সে বুঝতে পারল খবরটা ওর কাছে যেমনটা মনে হয়েছিল, আমার কাছে ঠিক তেমন সুখপ্রদ নয়। আমতা আমতা করে সে বলল, 'আসলে আমরা স্কুলে পড়েছি যে, আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। আমরা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং আমার মনে হয়েছে আমরা যা করি তাতেই তোমরা খুশী হবে। তাই তোমাকে খবরটা দিতে এলাম'।

এই ফারাক্কা দেখেছি এই ঘটনার কয়েক বছর পর। এই উপমহাদেশের প্রায় সবারই পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে আত্মীয়-বন্ধু আছে। এক আত্মীয়ের বিয়ে খেতে কলকাতা গেছি। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর ভাবলাম হাতে টাকা আছে, একটু ঘুরেফিরেই দেখি। রওয়ানা দিলাম দার্জিলিং। ট্রেন ফারাক্কা বাঁধের ওপর দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন রাত তিনটা। আমাদের জানালা যেপাশে সেদিক থেকে গঙ্গার ইণ্ডিয়ার অংশ দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মত উঁচু সে নদীর থৈ থৈ স্রোত দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। স্বভাবতই কৌতূহল হল একনজর নিজের দেশটাকে দেখার। ট্রেনের অন্যপাশে ছুট দিয়ে, ঘুমন্ত সহযাত্রীর গায়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকাই, দেখি কোথাও কিছু দেখতে পাচ্ছিনা! হায়! বাংলাদেশ গেল কই? প্রায় পাঁচ-দশ মিনিট ঝুলাঝুলি করে, চোখ পরিষ্কার করে, ফোকাস করার তীব্র চেষ্টায় চোখ চিকণ করে শেষে খুঁজে পেলাম প্রিয় জন্মভূমিকে, পরক্ষণেই তা চোখের জলের আড়াল হয়ে গেল। বাঁধের অনেক অনেক নীচে বিশুষ্ক তৃষিত জন্মভূমি আমার পানির অভাবে বিরাণভূমিতে পরিণত হয়েছে, পানি তো নেইই, নেই কোন গাছপালাও। আমরা তো খুঁজছিলাম দৃষ্টির সামনে, সে যে দৃষ্টিসীমার এতটা নীচে তা তো ভাবিনি!

ক'দিন আগে বাংলাদেশে এক আত্মীয়ার সাথে স্কাইপে কথা বললাম প্রায় তিনঘণ্টা। ব্যাকগ্রাউণ্ডে ভেসে আসছিল কার্টুন, গান আর সিনেমার আওয়াজ। হতবাক হয়ে গেলাম যে এর সবটাই হিন্দিতে। বাচ্চারা পেছনে বসে কথা বলছে প্রায়ই হিন্দিতে! আমি চার বছর মাদ্রাজে ছিলাম। কোনদিন কোন বাসা থেকে হিন্দি চ্যানেলের শব্দ পাইনি, অথচ প্রত্যেক বাসায় ডিশ সংযোগ ছিল। ওরা আমাদের সাথে ইংরেজী বলত কিন্তু ভুলেও কখনো হিন্দি বলতনা। ওরা হিন্দিকে ঘৃণা করে, কেননা ওরা জানে ভাষাই হল সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সবচেয়ে কার্যকরী বাহন। ওরা বাধ্য হয়ে ইণ্ডিয়ার অংশ হয়ে আছে বটে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে তামিল, মারাঠী, কেরালাইট বা আন্ধ্রাইট বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে, ইণ্ডিয়ান হিসেবে নয়। তাই ওদের নিজেদের পরিচয় ধরে রাখার এই প্রাণপণ প্রচেষ্টা।

ওদের এই অনুভূতি যে ওদের স্বতন্ত্রতা ধরে রাখার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমি বুঝি। আমার তখন এগার বছর বয়স। আবুধাবীতে থাকি। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল কিছুদিন। তখন এক আইরিশ নার্সের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ওকে বললাম, 'তোমার দেশ যে আজ শত শত বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এর জন্য আমরা তোমাদের খুব শ্রদ্ধা করি। তুমি আমাকে তোমার দেশ সম্পর্কে কিছু বল'। সে অনেক কিছুই বলল, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না, কারণ সে এমন কিছুই বলেনি যা আমি আগে থেকেই জানিনা। তখন বললাম, 'তুমি তোমার ভাষায় আমাকে কিছু বল, খুব সাধারণ কিছু, যেমন, 'আমার নাম রুশীন'। ওর চোখ দু'টো জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সে বলল, 'আমাদের স্কুলগুলোতে তো ইংরেজী পড়ানো হয়। শুধু আমি কেন, যারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে তারাও কেউ আর এখন আইরিশ বলতে পারেনা!' ভাবলাম, 'আহা! ওর একটা দেশ আছে, কিন্তু ওর কোন পরিচয় নেই, ভাষা নেই, নিজেদের পোশাক পর্যন্ত নেই। ওরা এমন একটি দেশের জন্য

যুদ্ধ করছে যার কার্যত কোন অস্তিত্ব নেই! ওরা তো আসলে এখন আইরিশ নামধারী ইংরেজ!'

একই ঘটনা দেখেছি সিকিমে। একটি স্বাধীন দেশকে বৃহৎ প্রতিবেশী গিলে খেয়ে ফেলেছে। পৃথিবী নির্বিকার! সিকিম আর নেপালের লোকজন ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন এলাকায় দারোয়ান, ঠেলাগাড়ীতে করে মাল নিয়ে বিক্রি করা, সার্কাস ইত্যাদি খুচরা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। ওরা না পারে হিন্দিতে লিখতে পড়তে, না পারে বিশুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলতে। ওদের না আছে কোন পুঁজি আর না আছে কোন সম্পদ। দেশের সম্পদ সবই অন্যের হাতে। কি করবে ওরা বেঁচে থাকার বেঘোর সংগ্রাম ছাড়া?

সুতরাং পরাধীনতা আইরিশদের মত দেশের আক্ষরিক অস্তিত্ব থেকেও হতে পারে বা সিকিমের মত দেশ বিলীন হয়েও হতে পারে। আইরিশরা স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করছে আজ শত শত বছর, আফগানিস্তান স্বাধীনতা ধরে রাখার চেষ্টা করছে শত বছর পার হয়ে গেল। আর কেউ যদি স্বাধীনতা অর্জন করেও তা বিকিয়ে দিতে চায়, তাকে কি রক্ষা করা সম্ভব? আমাদের হতভাগা দেশটা সেই ঐতিহাসিক কাল থেকেই মীরজাফরে পরিপূর্ণ। তাদের মেরেও শেষ করা যায়না। কত যুদ্ধ কত আন্দোলন, তবু তারা মাটি ফুঁড়ে গজাতেই থাকে আগাছার মত। তবে কি এই মীরজাফররাই আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে থাকবে? লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে স্বাধীনতার নামে পরাধীনতাই কি আমাদের ললাটলিখন?

আমার বাবা

মোহায়মিন, ঝিনাইদহ

স্যুটকেস গোছাতে গিয়ে দেখি লুঙ্গিটা ধরছে না। একটু ঠেসে ঢুকাতে গিয়ে মনে হল, বাড়ী থেকে আসার সময় আব্বা ঠেসে ঠেসে আমাদের ব্যাগে জিনিস-পত্র ঢোকাতেন। বেডশীট থেকে শুরু করে গাছের ফল, ডালের বড়ি, কাচা সবজি–সব কিছু দিতে চাইতেন। একবার তো গাছের সুপারিও দিয়ে দিয়েছিলেন। মা দেখে হেসেই অস্থির, 'তোমার ছেলে কি পান খায়, যে সুপারী দিচ্ছ!' মনে হত, পারলে তিনি পুরো বাড়ীটাই তুলে আমার সাথে দিয়ে দিবেন।

কয়েক বছর পর সপরিবারে বাড়ীতে যাচ্ছি। আমার বিষয়ে আব্বার প্রধান অনুযোগ ছিল, বাড়ীতে অনেক দিন পর পর যাওয়া নিয়ে। আব্বা চাইতেন, তার বউমা, নাতি-পুতি সবাই মিলে বাড়ীতে যাই। দেশেই থাকি, অথচ সবাই মিলে যাওয়া হত না। আজ যাব কাল যাব করে আমারও যেতে দেরী হয়ে যেত। শীতে যেতাম না ঠাণ্ডা লাগবে বলে, গরমে ঝিনাইদায় খুব গরম পড়ে, ফাল্গুন-চৈত্রে রাস্তাঘাটে খুব ধুলা থাকে, বর্ষাকালে আমার গায়ে বৃষ্টির ফোটা পড়লে সর্দি লেগে যায়, ঈদে রাস্তার যে হুজ্জত, অফিসে খুব কাজ– এই সব অজুহাতে আমার যাবার তারিখ কেবলই পিছাত। আব্বা বলতেন, নিজের গাড়ী আছে–এসব অজুহাত কেন? আমি তখন সড়ক দুর্ঘটনার কতভাগ প্রাইভেট কারের কপালে ঘটে তার পরিসংখ্যান শুনাতাম। আমি বাড়িতে যেতে তালবাহানা করলেও, আব্বা আমাদেরকে না দেখে থাকতে পারতেন না। অনেক সময় মাসে একাধিকবার এসেছেন। তার এনার্জি ছিল প্রচুর। সকালে বাসে উঠে বিকালে আমার বাসায় পৌঁছে আবার পরদিন সকালেই চলে যেতেন। আমরা ভাবতাম তিনি অত্যন্ত শক্তসামর্থ্য মানুষ, ভাবতাম এত কষ্ট করতে পারেন, কারণ তার এনার্জি ছিল প্রচুর। আসলে এনার্জি নয়, যে জিনিসটির তার প্রাচুর্য্য ছিল তা হচ্ছে ভালোবাসা।

এখন আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি, তার অতি আদরের বউমা, তার স্বপ্নের নাতি-পুতি সবাই, যাচ্ছি শুধু তাকেই দেখতে!!!

আমার বাসায় স্বল্পকালীন অবস্থানকালে তার একটা রুটিন ছিল। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়েই তিনি যেতেন নিউ মার্কেটে, বই কিনতে। তিনি বই কিনতেন পাগলের মত। বুক ভিউ এর সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আসার আগেই কথা বলে রাখতেন। বুক ভিউতে গেলে তারা কয়েক ডজন বই এর একটা স্তূপ তার জন্য রেডি করে রাখত। একজন বই আর লেখকের নাম বলত। যদি বইটি তার লাইব্রেরীতে না থাকত, তাহলে সেগুলো আলাদা করে কিনে রাখা হত। তিনি টাকা দিয়ে যেতেন, বই চলে যেত পার্সেলে।

তার এই বাছবিচার না করে বই কেনা নিয়ে আমি মাঝে মাঝে মৃদু আপত্তি করতাম। হজ্জে গেলে তিনি প্রচুর আরবী ইসলামী বই কিনলেন। আমি বললাম, আপনি-আমি কেউই আরবী পড়তে পারি না, ঝিনাইদহ শহরে আরবী বই পড়ে বোঝার মত লোকও হয়তবা নেই। তিনি বললেন, বই থাকলে পাঠকের অভাব হবে না। অবাক ব্যাপার যে, তার আরবী বই এর জন্য অনেক দূর থেকে এখন গবেষকেরা আসেন। শেষ যখন তার সাথে দেখা হল, তিনি একটা বই এর নাম করে বইটি কিনে পাঠানোর কথা বললেন। ঢাকায় ফেরার পর একবার ফোন করে খবরও নিয়েছেন, বইটি কেনা হয়েছে কিনা। মা একটু রসিকতা করে বললেন, 'তোমার কিছুই মনে থাকে না, আবার একটা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের নাম ঠিকই মনে থাকে!'

বই এর শখ তার ছোট বেলার। তা নিয়ে একটা মজার ঘটনাও আছে। তখন তিনি ক্লাস সিক্স-সেভেনে। ১৯৫১-৫২ সালের কথা। শরৎচন্দ্রের কোন একটা বই তার কেনার খুব ইচ্ছা। সেই সময়ে উপন্যাস পড়াটাই অভিভাবকেরা ভালো চোখে দেখতেন না। তার উপর কিনে পড়া! দাদা বইটি কেনার টাকা দেননি। আব্বা ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ভীষণ একরোখা। বইটি তাকে কিনতেই হবে। বই কেনার টাকা উপার্জনের জন্য আর কোন পথ না পেয়ে বসে গেলেন রাস্তায় ইট ভাঙতে। কেউ একজন তা দেখে ফেলে এবং দাদাকে খবর দেয়। সেই কৈশর থেকেই তার স্বপ্ন ছিল একটা লাইব্রেরী করার। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল।

আব্বা আত্মীয়-স্বজনকে খুব পছন্দ করতেন। নানা অসিলায় তার বিশাল বংশের কয়েকশ আত্মীয়কে দাওয়াত দিতেন। এমনকি আমি বাড়ীতে গেলে দেখতাম অনেককে তিনি খবর দিয়ে রেখেছেন। আজ তার বাড়ীতে এত মানুষ যে দাড়ানোর মত জায়গা নেই!

জুমআ'র ছালাতে আমাদের পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেব তার কথা বলতে গিয়ে অনেক কথার মধ্যে বললেন, 'আমি ছিলাম তার দানের একজন রেগুলার খদ্দের। সময়ে-অসময়ে তার কাছে যেতাম নানা ধরনের সহায়তার দাবী নিয়ে। দরিদ্র কারো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, তার কাছে গেলে বিয়ের খবরটা তিনি দিয়ে দিবেন। গরীব ছাত্রের পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের টাকা দরকার, তাকে জানালেই হ'ল। কারো চিকিৎসার জন্য সহায়তা প্রয়োজন, নুরুল আমিন সাহেবের কাছে গেলে কিছু একটা হবে।

এই কাজটাও তিনি করতেন নেশার মত করে। নিজে চলতেন কিছুটা কিপ্টেমি করে। কিন্তু আল্লাহ তার দানের হাতকে রেখেছিলেন অনেক প্রশস্ত। আব্বাকে অনেক সময় বলেছি, আপনি যে আমাকে বকাবকি করেন, আমি তো আপনার ক্লোন। আমার চেহারা থেকে শুরু করে স্বভাব, পছন্দ-অপছন্দ –সবই তো আপনার মত। তিনি খুব খুশী হতেন। কিন্তু এখন বুঝি, আমি তার এক কণাও হতে পারিনি। অনেক ক্ষেত্রে এ নিয়ে তিনি কিছু আপাত: অযৌক্তিক কাজও করতেন। কয়েক বছর আগে তার পিত্তথলীতে পাথর ধরা পড়ে। তিনি কোন ওষুধ খেলেন না। অপারেশন করতে যে খরচ হবে, তা একজন দরিদ্রকে দিয়ে আসলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, কোন ওষুধ ছাড়াই তার পিত্তথলির পাথর চলে গিয়েছিল। দানের মধ্যে তিনি জাগতিক সব সমস্যার সমাধানও খুঁজতেন।

তিনি খুব গোছালো আর সংসারী ছিলেন। মা কি রান্না করবেন, তাও তিনি ঠিক করে দিতেন। আমাকে কথায় কথায় বলতেন, 'তোমার তো সাংসারিক বুদ্ধি একদমই নেই'। আমি তার এ ধারণা খণ্ডন করতে চেষ্টা করতাম। বলতাম, আমি তো ঘর-সংসার করছি, বাচ্চাদের দেখছি, বাজার-সদাই করে সংসারই তো চালাচ্ছি। তিনি বলতেন, বেবীরা বাবা-মায়ের কাছে চিরকালই বেবী থাকে।

তিনি এত সংসারী ছিলেন যে, তার অনন্তঃ সংসারের সব আয়োজনও তিনি করে রেখে গিয়েছেন। শুরুর দিকে ধর্মপালন ততো না করলেও গত দুই যুগ ধরে ধর্মকে তার মূল উৎস থেকে জেনে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করতেন। তার অসুস্থতার সময়ে গ্রামের বাড়ির জমাজমি চাচাদের মধ্যে বণ্টনের সময়ে তিনি দাদার ভিটের জমির কোন অংশ নেননি, নিয়েছেন পারিবারিক কবরস্থানটি। তার এই সংসারের অনন্ত জীবনে যেন আল্লাহ তাকে সুখে রাখেন, শুধু এই দোয়াটাই করি, এই দোয়াটাই চাই।

ভিনদেশের চিঠি

আমার পবিত্র কুরআন হিফযের অভিজ্ঞতা

-খাদীজা আমাতুল্লাহ

আমার কুরানিক জীবনবৃত্তান্ত শুরুর আগে একটা গল্পের কথা উল্লেখ করতে চাই যা আমার হাফিযা হওয়ার স্বপ্নকে অঙ্কুরিত করেছিল। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, আমি যখন ৬ বছরের ছোট্ট মেয়ে তখন আমার শরীরে একটি অস্বাভাবিক রোগ বাসা বেঁধেছিল। সেই রোগে আমার সমস্ত শরীর ফুলে উঠেছিল যা থেকে ক্রমাগত রক্ত-পুঁজ নির্গত হচ্ছিল। এ কারণে পিতামাতার সাথে আমাকে কয়েকদিন হাসাপাতালে কাটাতে হয়। সেখানে প্রতিরাতেই আমি ঘুম থেকে জেগে উঠতাম আর সবসময়ই মাকে দেখতাম তাহাজ্জুদ পড়তেন আর আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করতেন যেন আমি সুস্থ হয়ে উঠি। তিনি আমার পাশে এসে বসতেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিতেন। আরো কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পরও উন্নতির কোন লক্ষণ না দেখতে পেয়ে আমরা বাড়ী ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করতে থাকলাম। একদিন আমার পিতা একজন আলেমকে ডেকে নিয়ে আসলেন আমার চিকিৎসার জন্য। যিনি কেবল কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে আমার গায়ে ফুঁ দিলেন এবং পানি পড়া খেতে দিলেন। আমি সে পানি খেলাম। খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠলাম। আবার আগের মত সুস্থ উচ্ছল বালিকায় পরিণত হলাম। তাঁর মতে, এটা ছিল আল্লাহ্‌র অদৃশ্য ইশারার ফল।

এই অভিজ্ঞতার পর আমি আমার ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী হলাম। কুরআন পড়ার জন্য আমার মন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। কিভাবে কুরআন আমাকে সুস্থ করল তা আমাকে জানতেই হবে। আল্লাহ সত্যিই বলেছেন, 'আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত *(ইসরা ৮২)*।' এমনকি জীবন-মৃত্যুর বিষয়টিও আমাকে ভাবিয়ে তুলল। কেন আমার পিতামাতা আমার জীবন বাঁচাতে এত মরিয়া হয়ে উঠলেন? কি এই জীবন? বেঁচে থাকা কি খুব আবশ্যক? যদি আবশ্যক হয় তবে তা কেন? কেন আমরা পৃথিবীতে বেঁচে আছি? আমাদের এই অস্তিত্বের পিছনে কি এমন উদ্দেশ্য নিহিত? যদি কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকত তবে আমরা কোথায় থাকতাম, কি করতাম? কবর নিয়ে আমার নতুন ভাবনা শুরু হল। আমি খুব সচেতনভাবে খুঁজতে থাকলাম আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব।

এরপর থেকে যত কষ্টই হোক না কেন, কোন সৎআমল করার সুযোগ পারতপক্ষে ছাড়তাম না। আল্লাহ সত্যিই বলেছেন, 'হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না' *(বাক্বারা ২১৬)*।

প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে আমি কুরআন শিক্ষার হালকায় যেতাম এবং প্রতি সপ্তাহান্তে তাফসীর, হাদীছ প্রভৃতি শেখার জন্য মাদরাসায় যেতাম। ১২ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই আমি কুরআন পড়া শিখে ফেললাম এবং বেশ কিছু সূরাও মুখস্থ করলাম। ততদিন আমি হাইস্কুলে পড়ি। হাইস্কুলে উঠে পড়াশোনার চাপ বাড়ায় আমি মাদরাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এমনকি কিছুদিন বাদে সেখানে যাওয়ার আর প্রয়োজন বোধ করতাম না। কোন হালকাতেও যেতাম না। কুরআনও তেমন পড়তাম না। এই অবস্থায় টানা দুই বছর চলে গেল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার চেতনা নিশ্চিহ্ন করে দেননি। কলেজে প্রবেশের পূর্বে আমি হঠাৎ করে আমার 'আমি'কে আবার ফিরে পেলাম। ঘটনা এই ছিল যে, আমার মা আমাকে বকা-ঝকা করতে শুরু করলেন মাদরাসা ও হালকা পরিত্যাগ করায়। আমি তাঁকে অনুযোগ করে বললাম, 'মা, আমাকে চাপাচাপি করো না, এতদিন পর সেখানে যেতে আমার লজ্জা করছে।' কিন্তু কোন যুক্তি মেনে না নিয়ে তিনি আমাকে পীড়াপীড়ি করতেই থাকলেন আর বললেন, তুমি যদি না যাও তাহলে আমি কখনই তোমাকে ক্ষমা করব না। বাধ্য হয়েই একদিন মাদরাসায় যেতে রাজি হলাম। কিন্তু প্রস্তুতির জন্য ঘরে যখন কুরআন খুলে বসলাম, দেখি আমি কুরআন পড়া প্রায় ভুলেই গেছি। আমার পড়ার গতি অনেক ধীর হয়ে গেছে। আমার এ অবস্থা দেখে আমিই হতবাক হয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারিনি দুই বছরের মধ্যে আমার এত অধঃপতন হয়েছে। আমার মনে হল, আমি তো জাহান্নামে চলে গিয়েছি। আমি তো শয়তানের দাস হয়ে পড়েছি। কতদিন যাবৎ কুরআন পাঠ ছেড়ে দিয়েছি! সেদিন আমি খুব কাঁদলাম। আল্লাহ্‌র কাছে আমার হেদায়েতের জন্য খুব দো'আ করলাম আর প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি অবশ্যই মাদরাসায় ফিরে যাব এবং দ্বিগুণ উদ্যমে দ্বীনী জ্ঞানার্জনের জন্য লেগে পড়ব। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আমি প্রতিজ্ঞামত কুরআন শিক্ষার হালকায় ভর্তি হলাম এবং আরবী ভাষা শেখার জন্য 'মা'হাদুল লুগাহ আল আরাবিয়া' (আরবী ভাষা শিক্ষা ইনিস্টিটিউট)-এ নাম তালিকাভুক্ত করলাম। তাছাড়া সপ্তাহান্তে তাফসীর ও হাদীছের ক্লাসে অংশ নেয়া শুরু করলাম। কোথাও ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হলে সাধারণতঃ বাদ দিতাম না। অচিরেই আমি আমার জীবনে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতের ছোঁয়া অনুভব করতে লাগলাম। শিক্ষকের পড়া আমি দ্রুত মুখস্ত করতে পারতাম। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, অন্যদের চেয়ে একটু আগেভাগেই আমি পড়া শিখে ফেলতে লাগলাম।

তারপর আমার নিকটজনদের কাছে সুযোগমত ইসলামের হুকুম-আহকাম পালনের দাওয়াত দেয়া শুরু করলাম। তাদের বুঝাতে লাগলাম, কোথায় রাসূলের সুন্নাত আর কোথায় আমরা? আমাদের সৎআমলের প্রতিযোগিতা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আর জান্নাত লাভের চেষ্টা করা উচিৎ, না কি খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি আর জাহান্নাম দখলের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ? বাড়িতে কি আমরা কুরআন পড়ি? পরিবারের কতজন সদস্য কুরআন ঠিকমত পড়তে পারে? আমাদের কতজন কুরআনের অর্থ জানে? কেন বিনোদনের অনুষ্ঠানে ১ম সীট দখলের জন্য আমরা প্রতিযোগিতা করি, অথচ ছালাতের সময় জামা'আতের শেষ কাতার ধরি? বর্তমান প্রজন্মের এ দুরবস্থা কেন? পশুর মত তারা যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে, আর বিবাহপূর্ব সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবারে অশান্তির রাজ্য বিস্তার করছে? কেন আমরা স্রষ্টার পরিবর্তে সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছি? কেন মূর্খের মত প্রতিযোগিতা করছি কে বেশী স্টাইলিশ আর কে বেশী ফ্যাশন্যাবল? অথচ আমরা সবাই মুসলিম। এক আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পিত। আমাদের উচিৎ ছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত মানবতার সর্বোত্তম জীবনাদর্শকে আপন বলয়ে ও সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করা। যেমন আল্লাহ বলেন, তোমরা কল্যাণকর্মে প্রতিযোগিতা কর' *(বাক্বারা ১৪৮)*। তিনি আরো বলেছেন, 'আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনব্যাপি, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে *(আলে ইমরান ১৩৩)*।

জীবনের এই আসল লক্ষ্য হারিয়ে মুসলিম যুবসমাজ তাদের আত্মপরিচয় হারাচ্ছে। তারা বিনোদন জগতের সেলেব্রিটিদের নিয়ে মেতে থাকছে। যে কণ্ঠ 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে ঝংকৃত হয়ে উঠার কথা ছিল সে কণ্ঠে এখন নষ্ট সংস্কৃতির জয়গান। আল্লাহভীতির অভাব, আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য না

জানা আর ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারণে আমরা মূর্খতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছি। আমরা ইসলামী জ্ঞানার্জনকে অবহেলা করে চলি। এর জন্য মোটেও সময় বের করতে পারি না। যে কুরআনকে আল্লাহ মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য নাযিল করেছিলেন, যে রাসূল (ছাঃ) ইসলামী জীবনাদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট নযীর রেখে গেছেন, তা সযত্নে দূরে ঠেলে আমরা কিসের পিছনে ছুটছি? আজকের কলুষিত সমাজে খুব কম সংখ্যক মানুষই এই দুরবস্থা থেকে মুক্ত। আল্লাহ আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন!!

এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদেরকে অবশ্যই সর্বপ্রথম সঠিক জ্ঞানার্জনকে গুরুত্ব দিতে হবে। বৈষয়িক জ্ঞানার্জনের পূর্বে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' *(আহযাব ২১)*। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে *(ফাতির ২৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২১৮, হাসান)*।

আল্লাহ্‌র কসম! মুসলিম তরুণ সমাজের এই দুরবস্থাই আমাকে একজন দাঈ এবং হাফিযা হিসাবে গড়ে তুলেছে। আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে কোন ইসলামী স্কুলে কুরআন ও হাদীছের শিক্ষক হিসাবে প্রস্তুত করতে। আমার একটাই পরিকল্পনা এই ফিৎনা থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করব এবং আমার সমাজকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সাধ্যমত সংগ্রাম চালাব।

এবার কুরআন হিফযের প্রসঙ্গে আসি। মিন্দানাও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে গত বছর ভর্তি হয়েছি। পড়াশোনার চাপ বেড়েছে অনেক। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ শত চাপের মধ্যেও আমি কুরআন হিফয অব্যাহত রেখেছিলাম। এমনকি আরবী ভাষা শিক্ষা এবং তাফসীর ক্লাসও চালিয়ে গেছি। আমার দৈনিক শিডিউল ছিল এমন যে, সপ্তাহের ৩দিন সকালে ইউনিভার্সিটিতে যেতাম, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর 'মা'হাদুল লুগাহ'তে যেতাম আর শেষ বিকালে যেতাম মাদরাসায় কুরআন হিফযের ক্লাসে। সপ্তাহের বাকি ২ দিন পুরোটাই ইউনিভার্সিটিতে কাটাতে হত। আর সপ্তাহান্তে তাফসীর ক্লাসে অংশ নিতাম। শুধু রাতেই বাড়িতে থাকতাম এবং ক্লাসের পড়া, হোমওয়ার্ক করতাম। শোয়ার আগে আবার কুরআন তেলাওয়াত করে প্রাত্যহিক কর্তব্য শেষ করতাম। সাধারণতঃ ফজরের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠে পড়তাম এবং কুরআন হিফয করতে বসতাম। কারণ আমার জন্য হিফযের সর্বোত্তম সময় ছিল ফযরের পূর্বে এবং পরে। দৈনিক অন্ততঃ ১ পৃষ্ঠা মুখস্থ করার পর উঠতাম। তারপর ঘর-দোর ঝাড়া-মোছা করে সকালের নাস্তার কাজে মাকে সাহায্য করতাম। এর মধ্যে ক্লাসের সময় হলে ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নিতাম। তবে ১৫ পারা মুখস্থ করার পর আমার দৈনন্দিন রুটিন একটু পরিবর্তন করলাম। দ্রুত হিফয শেষ করার জন্য আপাততঃ আরবী শিক্ষার ক্লাস বন্ধ করে দেই। হিফযের সাথে সাথে কুরআনের অর্থ বোঝারও চেষ্টা করি। হিফযের ব্যাপারে আমি এমনই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে, দৈনিক ১ পৃষ্ঠার স্থলে ৩/৪/৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুখস্থ করতে লাগলাম। কখনও ক্লাসের বাইরে শিক্ষকের বাড়িতে যেয়েও পড়া শুনিয়ে আসতাম। যখনই অবসর পেতাম হিফযে সময় দিতাম। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন টিচারের পড়ায় মনোযোগ না আসলে গোপনে কুরআন খুলে পড়তাম। বাড়িতেও হোমওয়ার্ক করার সময় কুরআন পার্শ্বে রাখতাম। শোয়ার সময় মোবাইলে ডাউনলোড করে রাখা শায়খ সুদাইস বা শুরাইমের তেলাওয়াত শুনতাম। অবশেষে সেই কাংখিত দিন আসল। ৬ই এপ্রিল ২০১১। আমার সমগ্র সত্তা সেদিন আনন্দে, প্রশান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠল। চোখ বেয়ে নামল আনন্দাশ্রুর বন্যা। আবেগে এতটাই রোমাঞ্চিত হয়ে পড়ি যে, পরবর্তী ৪ দিন আমি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলাম।

যদিও ৬ ভাইবোনের বড় সংসারে আমাকে যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস পরীক্ষা, সেমিস্টার চেঞ্জ পরীক্ষা, এসাইমেন্ট লেখা, কেস-রিপোর্ট জমা দেয়া ইত্যাদি কাজে আমার ব্যস্ততাও ছিল প্রচুর। কিন্তু এসব কিছুই আমার 'হাফিযা' হওয়ার স্বপ্ন পূরণে বাঁধা সৃষ্টি করেনি আলহামদুলিল্লাহ।

তবে এটা সত্য যে, হিফয সম্পন্ন করা মানেই যে সব শেষ তা নয় বরং এটা আরেকটি নতুন অধ্যায়ের শুরু। হিফযের একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, কিন্তু হিফয করার পর হিফয ধরে রাখার জন্য বার বার যে পুনরাবৃত্তি করতে হয়, তার কোন সীমা নেই। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই পুনরাবৃত্তি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। খুব কঠিন দায়িত্ব। তারপরও আমি পরম সুখী এজন্য যে, কুরআন আমার সার্বক্ষণিক সাথী। যদি কোনদিন কুরআন না পড়ি, মনটা খুব হতাশ হয়ে পড়ে। একটা কথা আমি নিজেকে সব সময় স্মরণ করিয়ে দেই যে, কুরআনের হাফিযা হওয়া কেবল নামের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, আমাকে আমার কাজ দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। আমি সব সময় খেয়াল রাখি যেন আমার প্রতিটি কাজ কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হয়। সবসময় সতর্ক থাকি যেন আমার নিয়তে কোন ত্রুটি না হয়ে যায়। আল্লাহ আমাকে এবং সকল মুসলিম ভাই-বোনকে সে তাওফীক দান করুন–আমীন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিয়তের উপরই আমলসমূহ নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যে সে নিয়ত করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যে আমাদের মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক 'মিন্দানাও স্টেট ইউনিভার্সিটি'র একটি বিল্ডিং ভাড়া নিতে পেরেছিলেন যার নাম দিয়েছিলেন 'দারুস সালাম'। এর উদ্দেশ্য ছিল এমএসইউ-এর স্টুডেন্টরা যারা দাওয়াতের কাজ করতে চায় বা কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দিতে চায়, তারা যেন স্বচ্ছন্দে এই বিল্ডিংটি ব্যবহার করতে পারে। আমি ও আমার কিছু বোন এই সুযোগটি কাজে লাগালাম। আমরা একটি বিজ্ঞপ্তি তৈরী করে বিভিন্ন কলেজ বিল্ডিং-এর নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেই। এতে আমরা ভালই সাড়া পাই। গত দুই সেমিস্টারে অনেক ছাত্রী এখানে কুরআন, হাদীছ ও আরবী ভাষা শিক্ষালাভ করেছে। আমরা সবাই এখানে স্বেচ্ছাসেবক। বর্তমানে ফিকহ, সীরাহ, তাফসীর প্রভৃতি বিষয়ে এখানে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা একটি সেমিনারও আয়োজন করেছি।

দারুস সালামে ক্লাস নিতে গিয়ে প্রথম দিকে আমি বেশ ভয় পেতাম। কেননা আমার স্টুডেন্টদের অনেকেই মাস্টার্সে অধ্যয়নরতা ছিলেন। আর বাকীরা আমার বয়সী। তবে যখন ভাবতাম আমার সব প্রচেষ্টাই কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তখন ভয় ও দুশ্চিন্তা কেটে যেত। সুন্দরভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারতাম আলহামদুলিল্লাহ। যখনই কোন কাজ কঠিন মনে হয় তখনই আমি আল্লাহকে স্মরণ করি। এতে সে কাজ আমার কাছে আর কঠিন মনে হয় না। বরং সাবলীল প্রশান্তিময় হয়ে উঠে। তখন মনে হয় আমি আল্লাহ্‌র সাহায্যে যেন হিমালয় পাহাড়কেও পদাঘাত করে আমেরিকা পাঠাতে পারব...হাহা..। আমার প্রিয় উক্তিটি দিয়ে লেখাটির সমাপ্তি টানছি। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একজন কুরআনের হাফেযের পরিচয় হল, সে দীর্ঘ রাত ধরে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়রত থাকবে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। সে ছিয়াম পালন করবে অথচ বাকীরা আহারে ব্যস্ত থাকবে। সে অন্তর্যাতনায় পীড়িত বোধ করে, যখন মানুষ খুশীতে আত্মহারা থাকে। সে নিশ্চুপ থাকে যখন মানুষ বেহুদা কথাবার্তা বলে। সে বিনয়াবনত থাকে যখন মানুষ কর্কশ আচরণ করে। সে হবে বিচক্ষণ, শান্ত ও বাকসংযত। কর্কশ আচরণ, গাছাড়া উদাসীনভাব, উত্তপ্ত মেজাজ, হৈ-হল্লা ইত্যাদি থাকবে তার চরিত্রের সম্পূর্ণ বাইরে *(ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছফওয়াহ, ১/৪১৩ পৃঃ)*।'

আল্লাহ আমাদের সকলকে অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ আমাদের মুসলিম তরুণসমাজকে সঠিক আক্বীদা ও আমলের দিকে পরিচালিত করুন। আমাদের সকলকে সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন!

লেখিকা : জেনারেল এডুকেশন বিভাগ, মিন্দানাও স্টেট ইউনিভার্সিটি, মারাওয়ী সিটি, মিন্দানাও।

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন ২০১১

রাজশাহী ৮ ও ৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয় 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স' সংলগ্ন ময়দানে 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন ২০১১' অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ এবং সাবেক কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও পাবনার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব রবীউল ইসলাম। ২ দিন ব্যাপী এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে বর্তমান কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণসহ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' মানে উন্নীত হওয়া সকল সদস্যকে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় আমন্ত্রণে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন সারাদেশ থেকে আগত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যেলা সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

১ম দিন বাদ আছর (বিকাল ৪.১৫) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটির আহবায়ক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি **মুযাফ্ফর বিন মুহসিন**। নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে তিনি সংগঠনের বিগত দিনের ইতিহাস স্মরণ করে বলেন, সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণের অকৃত্রিম প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আজকে এই দৃঢ় অবস্থানে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, যুগে যুগে আহলেহাদীছরাই মুসলিম সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছে। এদেশের বুকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তার কার্যক্রমের মাধ্যমে সেই প্রমাণই রেখে যাচ্ছে। এদেশে 'যুবসংঘ'-এর জন্ম এমন এক সময়ে ঘটে যখন স্বয়ং আহলেহাদীছরা কেবল 'রাফউল ইয়াদায়েন' করা ও 'আমীন' বলাকেই আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করত। অন্যদিকে ইসলামী নামধারী দলগুলো কেউ ফযীলত নিয়ে, কেউ পীর-মাজার পূজা নিয়ে আর কেউ বা পশ্চিমা গণতন্ত্রের পশ্চাদ্ধাবন করে ইসলামের সঠিক রাস্তা থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছিল। এমনই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দুর্যোগক্ষণে 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 'যুবসংঘ' ইসলামের নামে প্রচলিত এসকল পথভ্রষ্ট আক্বীদা ও আমলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং ইসলামের বিশুদ্ধ মানহাজ সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। ফলে শুরু থেকে অদ্যাবধি ঘরে-বাইরে সর্বত্রই 'যুবসংঘ' চরমভাবে ষড়যন্ত্রের শিকার। নানাভাবে চক্রান্তকারীরা দুনিয়ার বুক থেকে এ সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। তদুপুরি আল্লাহ্র অশেষ রহমতে বাতিলের হাজারো চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে 'যুবসংঘ' আজও পর্যন্ত বাংলার বুকে সগৌরবে দণ্ডায়মান; শুধু তাই নয় বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শনৈঃ শনৈঃ তার তৎপরতা বিস্তার করে চলেছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। দেশ-বিদেশের আনাচে-কানাচে আজ হক্বের যে বুলন্দ আওয়াজ গুঞ্জরিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তার পিছনে 'যুবসংঘ'-এর মত সংগঠনের পবিত্র দাওয়াত যে অনুঘটকের কাজ করে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব এ সংগঠনের সর্বোচ্চ কাণ্ডারী হিসাবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণকে আহলেহাদীছ আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ শিকার করতে হবে এবং সমাজের বুক থেকে জাহেলী রসম-রেওয়াজকে উচ্ছেদের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি নতুন-পুরাতন সকল কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে এই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার জন্য আহবান জানান।

অতঃপর বর্তমান কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুযাফ্ফর রহমান (সাতক্ষীরা), ইমামুদ্দীন (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ও শাহিদুজ্জামান ফারূক (সাতক্ষীরা) প্রমুখ। সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে আব্দুল খালেক মাষ্টার (রাজশাহী), গোলাম মোকতাদির (খুলনা), গোলাম যিল কিবরিয়া (কুষ্টিয়া পূর্ব), অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী), অধ্যাপক ফারূক আহমাদ (রাজশাহী), মাসঊদ বিন ইসহাক (খুলনা), মাওলানা ফযলুর রহমান (গাইবান্ধা), আওনুল মা'বুদ (গাইবান্ধা), আবু তাহের (গাইবান্ধা), আব্দুর রহীম (বগুড়া), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), অধাপক আকবার হোসাইন (যশোর), মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), তাসলীম সরকার (ঢাকা), শেখ রফিকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) এবং ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা)। সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), ড. এ এস. এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা) এবং অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও বর্তমানে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব **আব্দুল খালেক** মাষ্টার দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৯৭৮ সালেই আরাফাত পত্রিকার মাধ্যমে 'যুবসংঘ' গঠনের সংবাদ পাই এবং রাজশাহীতে আমার এলাকায় সর্বপ্রথম শাখা গঠন করা হয়। সেই থেকেই আমি এ সংগঠনের সক্রিয় কর্মী। দাওয়াতী কার্যক্রমের নীতি ও পন্থায় জমঈয়ত ও যুবসংঘের পারস্পরিক ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমি তখনই উপলব্ধি করেছিলাম। 'যুবসংঘ'-এর মাধ্যমেই আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম ইসলামের সঠিক মর্মার্থ কী। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, 'যুবসংঘ' সমাজবিপ্লবের যে মূলনীতি নিয়ে মাঠে নেমেছে তা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবলমাত্র প্রকৃত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা সভাপতি **মাওলানা ছফীউল্লাহ** বলেন, আল্লাহ প্রত্যেক যুগে তাঁর দ্বীনকে জীবিত করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন। এ দেশে আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফীর মৃত্যুর পর আহলেহাদীছ আন্দোলনে যে ভাটা পড়েছিল তা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং যুবসংঘের মাধ্যমে তা স্থায়ী ভিত্তি লাভ করেছে।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক **গোলাম মুক্তাদির** বলেন, আল্লাহ্র অশেষ রহমতে ১৯৮১ সালে যদি আমি মাযহাব ত্যাগ করে আহলেহাদীছ না হতাম এবং এ সংগঠনে যোগদান না করতাম তা হলে আমার জীবন আজ অন্যদিকে প্রবাহিত হত। তাই 'যুবসংঘ' আমার আলোকদিশারী সংগঠন। আজকে যে আহলেহাদীছ আন্দোলন এত এত ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সগৌরবে আদর্শের উপরে থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং পূর্বের চেয়েও দ্রুতগতিতে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, তার নেপথ্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মত একটি বলিষ্ঠ প্লাটফর্মের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আহলেহাদীছ যুবকদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরী হচ্ছে। একটা সংগঠন বেঁচে থাকার জন্য যে সাহিত্য দরকার ছিল সেটাও তৈরী হয়ে গেছে। এখন শুধু আমাদের কর্মীদেরকে তাদের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে যে, দ্বীনের জন্য আমরা প্রয়োজনে জীবনের সর্বস্বটুকুও কুরবানী দিতে জানি। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারব।

'আন্দোলন'-এর কুষ্টিয়া (পশ্চিম) যেলা সভাপতি **গোলাম যিল কিবরিয়া** তাঁর আবেগময় ভাষণে বলেন, 'যুবসংঘ আমার ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে এবং আমার সমাজে এক বিশাল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আসমানের নীচে যমীনের বুকে আহলেহাদীছ আন্দোলন ভিন্ন কোন ছহীহ ইসলামী আন্দোলন আর দ্বিতীয়টি নাই। তাই এ আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নেয়ার জন্য যুবসমাজকে আরো বলিষ্ঠ তৎপরতা ও নিত্য-নতুন কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য **অধ্যাপক ফারূক আহমাদ** বলেন, আহলেহাদীছ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার আল্লাহ ও রাসূল ছিলেন ভিন্ন। ১৯৮৪ সালে আহলেহাদীছ হওয়ার পর আমি প্রকৃত আল্লাহ ও রাসূলকে খুঁজে পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি আমলের পূর্বে আক্বীদার বিশুদ্ধতা কত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে সময় আন্দোলনের ময়দানে শামিল হয়েছিলাম তখন স্বয়ং আহলেহাদীছদেরকেই আহলেহাদীছ বানানোর কাজ করতে হয়েছিল। কেননা তখন অধিকাংশ আহলেহাদীছরা রাফউল ইয়াদায়েন, আমীন বলত ঠিকই; কিন্তু তাদের আক্বীদা ও আমলে আহলেহাদীছের কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যেত না। 'যুবসংঘ' তার কর্মতৎপরতা দিয়ে এ দেশের মানুষকে গতানুগতিক বাপ-দাদার আচরিত ইসলাম থেকে উদ্ধার করে রাসূল (ছাঃ) আনীত ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ চিনিয়েছে।

সঊদী আরব শাখার প্রচার সম্পাদক **সোহরাব হোসাইন** বলেন, ময়দান আজকে ইসলামের ছহীহ দাওয়াতের জন্য উন্মুক্ত। মানুষ জগাখিচুড়ী জিনিস আর চায় না। সবাই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। অতএব কর্মী ভাইদের প্রতি আকুল অনুরোধ, ঘরে বসে না থেকে দাওয়াতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আমরা যদি সত্যিকারঅর্থে তৎপর হই তাহলে ইসলামের এই ছহীহ দাওয়াত এদেশের বুকে বিজয়ী হতে মোটেও সময় নেবে না ইনশাআল্লাহ।

'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য এবং 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক **অধ্যাপক জালালুদ্দীন** বলেন, ঘুমন্ত আহলেহাদীছ জামা'আতকে জাগানোর জন্য যুবকদের যখন একটি বলিষ্ঠ প্লাটফর্মের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল, তখনই 'যুবসংঘ' 'সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর' শ্লোগান নিয়ে তাওহীদী চেতনার বাতিঘর হয়ে এ দেশের বুকে আবির্ভূত হয়। 'যুবসংঘ' অহিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যখন থেকে কাজ শুরু করেছে তখন থেকে এ সংগঠনের বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে ষড়যন্ত্র চলেছে। কিন্তু ফেরাউন, নমরূদ যেমন হক্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে টিকতে পারেনি, তেমনি বাতিল শক্তিও টিকতে পারেনি আলহামদুলিল্লাহ। অতএব জিহাদের উত্তরসূরী কর্মী ভাইরা, পরকালীন জীবনে চূড়ান্ত বিজয় লাভের জন্য ইখলাছের সাথে দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে চলুন। তাহলে দুনিয়ার কোন বাতিলশক্তি আপনার জন্য বাঁধা হতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক **মাসঊদ বিন ইসহাক** দীর্ঘ স্মৃতিচারণে বলেন, আজ ১৬ বছর পর আবার আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পেরে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বোধ করছি। যুবসংঘ গঠনের পূর্বেই যখন ড. গালিব ১৯৭৫ সালে 'আঞ্জুমানে শুব্বানে আহলেহাদীছ' গঠন করেন তখন থেকেই আমি ছিলাম তাঁর সাথী। এ সংগঠনের যে বীজ সেদিন বপিত হয়েছিল আজ তা বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। যদি আমি যুবসংঘের এই মহীরূহের শীতল ছায়াতলে না আসতাম তাহলে ইসলাম কি তা আমি জানতে পারতাম না। নানা অপসংস্কৃতির সাথে যখন আমি জড়িত ছিলাম তখন ড. গালিবের হাত ধরেই আমি এ পথের সন্ধান পেয়েছি। এজন্য আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। 'যুবসংঘ'-এর এই মহীরূহকে আর ছাগল-গরুতে নষ্ট করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাই কর্মী ভাইদেরকে বলব, আসুন আমরা বুকে বল নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্মুখপানে দৃঢ়পদে অগ্রসর হই এবং এই মহীরূহের সুশীতল ছায়ার নীচে আজও যারা আসতে পারেননি তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছে দেই, যেন তারাও এই ছায়াতলে এসে শান্তির দিশা খুঁজে পায়।

বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি **আব্দুর রহীম** বলেন, আহলেহাদীছ হওয়ার পর বহু চড়াই-উৎরাই মাড়িয়ে আমরা বগুড়া যেলায় 'যুবসংঘ'-এর কার্যক্রম চালিয়ে এসেছি। আল্লাহ্‌র রহমতে দাওয়াতের প্রচার-প্রসার ঘটায় সামাজিক বাঁধা-বিঘ্নতা আজ অনেকগুণ কেটে গেছে। সেই সময়কার অবস্থা থেকে আজকের অবস্থা অনেক অনেক গুণ ভাল। আমাদের সামনে এখন কাজের বিরাট সুযোগ। মানুষ এখন আমাদের দিকে মুখিয়ে আছে। অতএব সার্বিক কর্মতৎপরতা নিয়ে আজ মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দেয়া আমাদের জন্য ফরয দায়িত্ব হয়ে পড়েছে।

'আন্দোলন'-এর সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি **মাওলানা আব্দুল মান্নান** বলেন, আমাদের সঠিক কর্মপন্থা রয়েছে। রয়েছে যোগ্য নেতৃত্ব। নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীও তৈরী হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সংগঠনকে নিয়মিত সময় দেয়ার মত কর্মী আমাদের আরো প্রয়োজন। তাই আমাদের যুবসমাজকে তাদের জাগ্রত জ্ঞান ও মেধাশক্তিকে এ আন্দোলনের অগ্রগতি সাধনে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক তাবলীগ সম্পাদক জনাব **মাওলানা আবু তাহের** বলেন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যরা প্রত্যেকেই একেকজন যোগ্য দাঈ ইলাল্লাহ এবং উঁচুমানের সংগঠক। কিন্তু আমরা যেন অনেকটাই ঘুমিয়ে পড়েছি। এ ঘুম আমাদের অবশ্যই ভাঙ্গাতে হবে। পৃথিবীর বুকে অভ্রান্ত সত্যের বাণীকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে। তবেই সমাজ পরিশুদ্ধ হবে।

'আন্দোলন'-এর সাতক্ষীরা যেলা সেক্রেটারী **মাওলানা আলতাফ হোসেন** বলেন, আজকে নবীন-প্রবীণ কাউন্সিলদের এই মিলনমেলা সংগঠনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। বয়োবৃদ্ধ যে সকল কাউন্সিল সদস্য এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সংগঠনের এই ছহীহ দাওয়াতকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসা সেই প্রবীণ সহযোদ্ধাদের উপস্থিতি আজকের এই মজলিসে কি যে এক প্রশান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। মুরুব্বীদের প্রতি অনুরোধ তারা আমাদের নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে যাবেন যেন তাদের পথ ধরে আমরা আরো দুর্বার গতিতে এ আন্দোলনের ঢেউ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারি।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি **অধ্যাপক আকবার হোসেন** বলেন, আমি আল্লাহর কাছে সবসময় শুকরিয়া আদায় করি এজন্য যে, তিনি আমাকে বিনা বেতনে 'যুবসংঘ'-এর মত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগদান করেছিলেন। যে প্রতিষ্ঠান আমার জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটা এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষিত হয়ে 'যুবসংঘ'-এর কর্মীরা দেশ-বিদেশের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে অত্যন্ত সততা ও সুনামের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় তারা প্রত্যেকেই আজ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য বোনাস হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। অতএব যারা আজও পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের সন্ধান না পেয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে, তাদেরকে পথের সন্ধান দেয়া এবং সমাজ বিপ্লবের মঞ্চে একজন সাহসী যোদ্ধা হিসাবে দায়িত্ব পালন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক যশোর যেলা সভাপতি **মোরশেদ আলম** বলেন, 'যুবসংঘ'কে আজকের এ পর্যায়ে আসতে বহু বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু বাধার ফলে সংগঠনের মযবুতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সংগঠন মানুষের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিতে পেরেছে।

'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলা সাধারণ সম্পাদক **তাসলীম সরকার** বলেন, একজন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য কখনও সাবেক হয় না। তারা সংগঠনের খুঁটি। কারণ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসাবে সে এ মর্মে শপথ নিয়েছিল যে, সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হবে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। সুতরাং বয়সের কারণে সে যদিও সাবেক হয়ে যায়; কিন্তু তাতে তার দায়িত্ব সাবেক হয়ে যায় না। আমাদের অনেক ভাই সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নিজের দায়িত্ব শেষ ভেবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য। বরং একজন কাউন্সিল সদস্য আমৃত্যু সংগঠনের কর্মী হিসাবে নিজেকে তৎপর রাখবে এটাই তার ঈমানী দায়িত্ব।

'আন্দোলন'-এর খুলনা যেলা সভাপতি **মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম** বলেন, বক্তব্যের মঞ্চ আজ সরগরম। কিন্তু আসল কর্মক্ষেত্র হ'ল ময়দান। দুঃখজনক হল, আমরা দেখেছি যারা একসময় মঞ্চ গরম করেছেন তারা আজ অনেকেই নরম ঈমানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পিছু হটে গেছেন। এসব দেখে আমরা অনেক সময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু হতাশ হলে চলবেনা। যুবসংঘ যে আন্দোলনের উদ্ভাস এদেশে ঘটিয়েছে তার হাল কেউ ছাড়বে আবার কেউ

এসে ধরবে। বিপদ আসবে আবার সফলতা ধরা দেবে। এভাবে এ আন্দোলন চলতেই থাকবে। এই মহীরূহকে মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টা কোনদিনই সফল হবে না ইনশাআল্লাহ।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি **ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম** দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, যুবসংঘ যে মহৎ প্লাটফর্ম গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশে, তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেও সকল দল ও মতের যে কোন সৎ উদ্যোগকে উদারভাবে সহযোগিতা করার সামর্থ্য রাখে। আমরা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কাছে কৃতজ্ঞ যে, তাঁকে আমাদের আদর্শিক শিক্ষাগুরু হিসাবে পেয়েছি। অন্য সকল প্রতিষ্ঠানে আমরা পুঁথিগত বিদ্যা শিখেছি কিন্তু যুবসংঘে এসে আমরা আদর্শকে শিখেছি, আদর্শ চিনেছি। এই আদর্শের উপর টিকে থাকতে পারলেই আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। এই আদর্শ রক্ষার স্বার্থেই 'যুবসংঘ' ২০০৬ সালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম ঘোষণার অপতৎপরতাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। আজকে যারা সংগঠন থেকে ছিটকে পড়েছেন, তারা মূলতঃ সংগঠনের আদর্শ বুঝতেই ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ আদর্শকে না চিনতে পারলে এ সংগঠনে কখনো টিকে থাকা যায় না। সামান্যতম স্বার্থে ঘা লাগলেই তখন আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, এটাই চরম বাস্তবতা। এজন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ভাইদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান, যে যেখানেই থাকি না কেন আদর্শিক পদস্খলন যেন আমাদের কখনই গ্রাস করতে না পারে। কেননা এ সংগঠন হাযারো আদর্শজ্ঞানহীন জনশক্তি নয়; বরং আদর্শ সচেতন ক্ষুদ্র একদল কর্মীর মুখাপেক্ষী। যদি একজন আদর্শবান কর্মীও এ সংগঠনে থাকেন, তবে তিনি একাই সংগঠনের জন্য বিরাট সম্পদ। নেতা-কর্মীর সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতেই পারে; কিন্তু আদর্শের কোন পরিবর্তন নেই, তা চির অম্লান। তাই আসুন! যে কোন মূল্যে এই আদর্শকে আমরা উচ্চকিত রাখি এবং প্রত্যেকেই এক একজন আদর্শ সচেতন কর্মী হয়ে গড়ে উঠার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি **ড. এএসএম আযীযুল্লাহ** দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের নানা বাধা-বিপত্তির দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করে তাঁর বক্তব্যে বলেন, যুবসংঘকে তার আদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য বহু সংগ্রামের সাক্ষী হতে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৮ সালে এ সংগঠন যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছিল আল্লাহ্র রহমতে আজও পর্যন্ত সে আদর্শের চুল পরিমাণ বিচ্যুতি ঘটেনি। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সফলতার মূলমন্ত্র এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এখানেই। ২০০৫ সাল থেকে আদর্শ বিচ্যুতির জন্য সরকারী ও অভ্যন্তরীণ নানা ষড়যন্ত্র যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছিল তা থেকে আত্মরক্ষা করে এ সংগঠন যে অদ্যাবধি স্বীয় আদর্শ নিয়ে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে তা এটাই প্রমাণ করে যে, এ আন্দোলনকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। মিডিয়া এবং অপপ্রচারকারীদের শত-সহস্র মিথ্যা প্রচারণা এ সংগঠনকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। তাই যারা আমাদের মধ্য থেকে পদস্খলিত হয়ে দূরে সরে গেছেন, আমি তাদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে আহবান করছি, আপনারা নিজেদের ভুল উপলব্ধি করুন এবং এই কাফেলায় পূর্বের ন্যায় আবারো ভূমিকা রাখার প্রতিজ্ঞা নিন। মনে রাখতে হবে এ সংগঠনকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাকে-আপনাকে সংগঠন করতে হবে–এটা নয়। কেননা আল্লাহ্র দ্বীন আল্লাহ্ নিজেই রক্ষা করবেন। কিন্তু আমরা যদি পরকালীন মুক্তি পেতে চাই তবে এ সংগঠনকে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি **অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম** স্বীয় সাংগঠনিক জীবনের দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছরের স্মৃতিচারণ করেন এবং সংগঠনিক মযবুতির প্রতি জোর তাকীদ প্রদান করেন। তিনি আবেগী কণ্ঠে বলেন, উর্ধ্বতন সংগঠনের দায়িত্বশীল হওয়ার পরও যুবসংঘকে আমি প্রতিনিয়ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। এজন্য এ সংগঠনে নিয়মিত হারে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সাথে সাথে আমার বেতন থেকে বার্ষিক এক মাসের বেতন আমি যুবসংঘের জন্য বরাদ্দ রাখব ইনশাআল্লাহ। আমি আমার অন্যান্য সাথী ভাইদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করছি।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অভিজ্ঞ ত্যাগী কর্মী **অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম** আবেগাপ্লুতকণ্ঠে সংগঠনের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিপদ, মুছীবত, মূল্যায়ন, অবমূল্যায়ন যত কিছুই আসুক না কেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী কখনো আপন চলার পথ থেকে ছিটকে পড়তে পারে না। হক্বের পথে টিকে থাকতে পারাটাই একজন কর্মীর জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমি সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি প্রশংসা। কেননা প্রশংসা একজন কর্মীকে পিছিয়ে দেয়। ১৯৮৯ সালের বিভক্তি, ২০০১ সালের ষড়যন্ত্র, ২০০৬ সালের দুর্যোগ মুহূর্তগুলোর দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, হক্বের পথে বাধা আসবে, চ্যালেঞ্জ আসবে এটাই স্বাভাবিক। এ সকল বাধাকে মুকাবিলা করার জন্য একজন কর্মীকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বোপরি যত বাধাই আসুক না কেন হক্বের বিজয় অবশ্যম্ভবী। অতএব যে কোন পরিস্থিতিতে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক **ড. সাখাওয়াত হোসাইন** 'মাসিক আত-তাহরীক' প্রকাশের প্রাথমিক দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। সাংগঠনিক জীবনের নানাদিক উল্লেখ করে তিনি ২০০৫-০৬ সালের সেই বিপর্যয়কর মুহূর্তগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেন। বিশেষ করে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক হিসাবে তাঁর উপর নানামুখী যেসব আক্রমণ চালানো হয় তা বিবৃত করতে যেয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক রাজনীতির পঁচা ড্রেনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য 'আত-তাহরীক'কে সেদিন হাতিয়ার বানানোর অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্র অসীম রহমতে এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিরন্তর প্রেরণায় আমরা সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হতে দেইনি। এটাই ছিল সেদিন আমাদের অপরাধ। সেই অপরাধের কারণেই আমাদের বহু লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হতে হয়েছে। তবে এতকিছুর পরও আল্লাহ্র রহমতে আদর্শের প্রশ্নে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তার অবস্থান থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হয়নি, এটাই আমাদের দৃঢ় মনোবল যোগায়। এভাবেই এই আন্দোলন যাবতীয় বাধার প্রাচীর মাড়িয়ে তার লক্ষ্যপানে দৃপ্তপদে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক **অধ্যাপক নূরুল ইসলাম** সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তাঁর বক্তব্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভূমিকাকে কাব্যাকারে উপস্থাপন করে এমন একটি আয়োজনের জন্য 'যুবসংঘ'-এর কর্মপরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব **রবীউল ইসলাম** বলেন, এমন একটা সময় ছিল যখন আমি নিজে আহলেহাদীছের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ড্রামা করে বেড়াতাম, আমি দ্বীনকে চিনতাম না। কিন্তু আল্লাহ্র অসীম কৃপায় 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াত পেয়ে আমি আমার নিজেকে ফিরে পেয়েছি। আমি দ্বীনকে চিনতে শিখেছি। আমার সন্তান, আমার পরিবারও দ্বীনকে চিনেছে। 'যুবসংঘ' যদি না থাকত তাহলে আমি এ পথে আসতে পারতাম না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কথাই বলতে পারি যে, বাধা আসবে, বাধা থাকবে, আবার চলে যাবে। তাই বাধার কাছে হার মানা যাবে না। বাধার মাধ্যমেই বরং সংগঠনের অগ্রগতি, মযবুতি আরো বৃদ্ধি পাবে। বাধা বাধা হয়ে পড়ে থাকবে, হক্ব এগুতেই থাকবে, বাতিল হক্বের বিরুদ্ধে সফল হবে না ইনশাআল্লাহ।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা **প্রফেসর নযরুল ইসলাম** বলেন, দুঃখ হয় যখন দেখি শ্রদ্ধা করার মত মানুষগুলো হঠাৎই চেহারা বদলে ফেলেন। তখন আমার কেবলই স্মরণ হয় বৃটিশবিরোধী যুদ্ধের দুঃসাহসী কমাণ্ডার ইয়াহইয়া খানের কথা, যার গর্বোদ্ধত চেহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশের এক শিল্পীর চিত্রকর্মে হায়েনার রূপে দেখা দিয়েছিল। মানুষের মুখ থেকে হায়েনার মূর্তি বেরিয়ে আসার এ দৃশ্য আমি অনেকবার দেখেছি 'আন্দোলন'-এ আসার পর। তদুপুরি আমরা হতাশ নই। কোন আন্দোলন যদি তার সংগ্রামকে অগ্রসর করতে চায় তবে ৩টি জিনিস প্রয়োজন- বই, বই এবং বই। রাসূল (ছাঃ) আলাহ্র পক্ষ থেকে যে গ্রন্থটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই পৃথিবীর ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিল। 'যুবসংঘ' তার সংগ্রামকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সে সাহিত্য আজ পেয়ে গেছে। এখন 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে। যার নেতৃত্বে আসছে ইসলামপন্থী দলগুলি। কিন্তু তারা সঠিক ইসলামপন্থী কি

না তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর সন্দেহ। তাই দুনিয়াকে যদি সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে হয় তবে আপনাদেরকেই সামনে এগিয়ে আসতে হবে। সংকীর্ণ দেশীয় গণ্ডিতে আটকে থাকার সুযোগ নেই আপনাদের। এই 'যুবসংঘ'কে আমি দুনিয়ার বুকে একমাত্র দল হিসাবে দেখি, যারা নেতৃত্ব দিলে দুনিয়া সঠিক নেতৃত্ব পাবে। সেই ছবি দেখতে পাই আমি আপনাদের মাঝে। তাই এ দলকে আমি কেবল বাংলাদেশভিত্তিক নয়, বরং একদিন দেখতে চাই আন্তর্জাতিক দল হিসাবে।

'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আজকের এই আনন্দঘন মিলনমেলা আমার কাছে যেন বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি মনে হচ্ছে। আন্দোলন যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন আর প্রতিষ্ঠাতার প্রয়োজন হয় না। এখন প্রতিষ্ঠা আপনারাই দিবেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি- আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। আমিও আজ আপনাদেরকে বলব- আমি আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি এ আন্দোলনকে, এই আমানতের হক্ব আদায়ের জন্য আপনারা কি রাজি আছেন? 'যুবসংঘ'-এর ছেলেরা তোমরা কি রাজি আছ? মুরুব্বীরা দো'আ করবেন এবং ছেলেরা কাজ করবে। ইবরাহীমের মত পিতা ইসমাঈলের মত সন্তান না থাকলে কখনও কুরবানী ও আত্মত্যাগের ইতিহাস রচিত হত না। যখনই জাতির সামনে ইবরাহীমের মত নেতৃত্ব থাকবে এবং ইসমাঈলের মত আত্মোৎসর্গকারী যুবশক্তি থাকবে তখনই একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। যতদিন পর্যন্ত পিতারা ইবরাহীমের মত না হবেন এবং সন্তানরা ইসমাঈলের মত না হবেন ততদিন এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা পাবে না। আজকের এই কাউন্সিল সম্মেলন আমাকে যেন বিদায়ের বার্তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমি অনুভব করছি এ আন্দোলনের হাল ধরার মত যোগ্য লোক তৈরী হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। 'যুবসংঘ'-এর যে সকল সাবেক সভাপতি এখানে সম্মাননা নিলেন তাদের প্রত্যেকেই সাংগঠনিক মেধা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। আমি তাদের সকলের জন্য দো'আ করছি আল্লাহ যেন তাদেরকে এ আন্দোলনের হাল ধরার যোগ্যতা দান করেন। এর জন্য যে আদর্শিক দৃঢ়তা, লক্ষ্যের অবিচলতা, জ্ঞানের গভীরতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন, তার প্রতিফলন অনেকের মাঝেই দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। তোমাদের প্রতি অনুরোধ, যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল স্রোতে এ তরীকে রেখে যাচ্ছি তোমরা একে যথাস্থানে পৌঁছনোর চেষ্টা করো। আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আন্দোলনের যে বীজ উপ্ত হয়েছে সে বীজ মহীরূহ আকারে আমাদের কার্যে, আমাদের আন্দোলনে, আমাদের কর্মে, আমাদের বৈষয়িক জগতে যেন প্রতিফলিত হয় সেই প্রার্থনা করছি। কেবল ছালাতের ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ নয়, বরং আহলেহাদীছ হতে হবে ধর্মীয় জীবনে, বৈষয়িক জীবনে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে। আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন।

'যুবসংঘ'-এর ৩৩ বছরের ইতিহাসে 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' মানে উন্নীত হওয়া সকল কর্মীদের এই মিলনমেলা এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করে। দীর্ঘদিনের পুরনো সাথীদের একত্রে পেয়ে আবেগী হয়ে পড়েন অনেকে। আলোচনার মঞ্চে উঠে অতীতকে স্মরণ করতে যেয়ে বার বার স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছিলেন বক্তারা। সারাদেশ জুড়ে যারা এতদিন সংগঠনের দাওয়াত নিয়ে মঞ্চ কাঁপিয়ে এসেছেন, দীর্ঘদিন বাদে তারা নিজেদেরকে শ্রোতাদের আসনে আবিষ্কার করে ক্ষণিকের জন্য হলেও ফেলে আসা দিনগুলোতে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক এ সম্মেলনকে স্মৃতিময় করে রাখা এবং আন্দোলনের পূর্বসূরীদের অবিচল সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিশেষভাবে মনোনীত পাঁচজন সাবেক 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'কে 'সম্মাননা স্মারক' প্রদান করা হয়। তাঁরা হলেন মাষ্টার আব্দুল খালেক, মাওলানা ছফীউল্লাহ, জনাব গোলাম মুক্তাদির, মাওলানা আব্দুর রহীম এবং অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। এছাড়া 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতিদেরকেও বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। বিশেষ অতিথিবৃন্দসহ 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া সাবেক ও বর্তমান সকল কাউন্সিল সদস্যকে সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ডায়েরী, কলম ও ক্যালেণ্ডার উপহার প্রদান করা হয়।

সম্মেলনের বিশেষ আয়োজন ছিল 'যুবসংঘ'-এর ফেলে আসা ৩৩ বছরের কর্মকাণ্ডের উপর একটি বিশেষ প্রদর্শনী। যেখানে স্থান পায় 'যুবসংঘ' আয়োজিত তাবলীগী ইজতেমা, বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং-এর পোষ্টার, লিফলেট, আলোকচিত্র, পত্রিকার কাটিং ইত্যাদির অনেক দুর্লভ ডকুমেন্ট। এছাড়া আরো স্থান পায় ১৯৭৮ থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বার্ষিক ক্যালেণ্ডার, হ্যাণ্ডবিল, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি যা উপস্থিত দর্শকদের স্মৃতিকাতর করে তোলে। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানোর জন্য 'যুবসংঘ'-এর কর্মীরা অনুষ্ঠানস্থলের প্রবেশপথে মাটির উপর চিত্রিত করে দৃষ্টিনন্দন শৈল্পিক আর্ট এবং সংগঠনের বিভিন্ন শ্লোগান, যা সম্মেলনের শোভা বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১২ সফলভাবে অনুষ্ঠিত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিন ব্যাপী ২২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারী রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবারের তাবলীগী ইজতেমায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লাখো কর্মী ও সুধী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১ম দিন বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর একে একে দু'দিনব্যাপী দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বক্তব্য পেশ করেন। সম্মেলনের ২য় দিন পৃথকভাবে যুবসমাবেশ, মহিলা সমাবেশ এবং মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২য় দিন বা'দ ফজর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

যুবসমাবেশ

তাবলীগী ইজতেমা'১২-এর ২য় দিন বেলা সাড়ে ১১-টায় প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** যুবসংঘের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আমাকে ওয়াদা দাও আগামী দিনে তোমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে রাযী আছ কি-না? সকলে সমস্বরে আমীরে জামা'আতের উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওয়াদাবদ্ধ হন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে প্রথমবারের মত জাতীয়ভিত্তিক 'গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০১২' অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমা'১২-এর ২য় দিন সকাল ১০টায় 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে প্রতিযোগীরা ২টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে *('ক' গ্রুপ : থিসিস এবং 'খ' গ্রুপ : নবীদের কাহিনী ১ ও ২)* অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে 'ক' গ্রুপে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হল যথাক্রমে আব্দুল হাসীব (রাজশাহী), আব্দুল মান্নান (রাজশাহী) ও শামীম আহমাদ (জয়পুরহাট) এবং 'খ' গ্রুপে যথাক্রমে আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া), আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ও আব্দুল্লাহ আল-মারূফ (বগুড়া)। এছাড়া প্রতি গ্রুপে ৫ জন করে মোট ১০ জনকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রতি গ্রুপের শীর্ষ তিনজনকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও আর্থিক পুরস্কার এবং বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্তদের জন্য সম্মাননা ও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। ইজতেমার ২য় দিন বা'দ এশা ইজতেমামঞ্চে প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা।